

প্রধান সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায় নাম	পৃষ্ঠা নং
অধ্যায় - ০১	বাংলা ব্যাকরণ ও ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব	
অধ্যায় - ০২	বাংলা ভাষা	
অধ্যায় - ০৩	বাংলা ধ্বনিত্ব	
অধ্যায় - ০৪	রূপতত্ত্ব	
অধ্যায় - ০৫	বাক্যতত্ত্ব	
অধ্যায় - ০৬	বাক্য সংকোচন, বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন	
অধ্যায় - ০৭	বিরচন (ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম)	
অধ্যায় - ০৮	ভাষণ ও প্রতিবেদন	
অধ্যায় - ০৯	পত্র লিখন	
অধ্যায় - ১০	প্রবন্ধ রচনা	

অধ্যায়
০১

বাংলা ব্যাকরণ ও ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	১	১	১
২০২৩	—	—	—
২০২২	১	—	—

“বাঙালি যেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে বলতে পারবে ‘বাঙালির বাংলা’

সেদিন তারা অসাধ্য সাধন করবে।”



অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ কাকে বলে?

[বাকাশিবো-২০২৪, ২০২২]

উত্তর: যে-গ্রন্থ বাংলা ভাষাকে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে তার গঠন-প্রকৃতি ও স্বরূপকে চিনিয়া দেয়, তাকে শুদ্ধভাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার করতে শেখায়, তাকে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভাষার মৌলিক কয়টি অংশ রয়েছে?

উত্তর: প্রত্যেক ভাষারই মৌলিক ৪টি অংশ রয়েছে, যথা:

(১) ধ্বনি (Sound),

(২) শব্দ (Word)

(৩) বাক্য (Sentence) এবং

(৪) অর্থ (Meaning)

২। ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় কয় ভাগে বিভক্ত হয়েছে?

[বাকাশিবো; ২০২৪]

উত্তর: ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয় চার ভাগে বিভক্ত, যথা—

(ক) ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)

(খ) রূপতত্ত্ব বা শব্দতত্ত্ব (Morphology)

(গ) বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

(ঘ) অর্থতত্ত্ব (Semantics)

উল্লিখিত এই চার তত্ত্ব নিয়েই ব্যাকরণের কাঠামো গড়ে উঠেছে। এছাড়া অভিধানতত্ত্ব (Lexicography), ছন্দ ও অলংকার প্রভৃতিও ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। ব্যাকরণ পাঠের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

[বাকাশিবো ২০২৪]

উত্তর: বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। জন্মের পর থেকে আমরা এ ভাষা শিখতে শুরু করি। কোনোরূপ বিদ্যার্জন ছাড়া আমরা এ ভাষায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের ভাব প্রকাশ করি। কিন্তু বাংলা ব্যাকরণ চর্চা ছাড়া এ ভাষা সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্ভুলভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। বাংলা ব্যাকরণ হলো বাংলা ভাষার বিধিগ্রন্থ, যা বাংলা ভাষাকে বিচার-বিশ্লেষণ এবং ভাষা পরিশুদ্ধ করে। নানা কারণে বাংলা ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।

❖ নিচে বাংলা ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা হলো:

- বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষাবিষয়ক বিজ্ঞান। এটি বাংলা ভাষার ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য, বাক্যার্থ, অলংকার প্রভৃতি উপাদানগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করে আমাদের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।
- প্রত্যেকটি ভাষা নদীর স্রোতের মতো প্রবাহমান। বাংলা ভাষাও অনুরূপভাবে গতিশীল। বাংলা ভাষার এ গতিশীলতার কারণে বিশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হয়। বাংলা ব্যাকরণ ঐ বিশৃঙ্খলা রোধ করে নিয়মনীতির সাহায্যে উপাদানগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান ও সামঞ্জস্য বিধান করে।

- আমাদের ব্যবহারিক কথাবার্তায় ও লিখনের ভাষায় অসংখ্য ভুল হয়। ব্যাকরণে দখল থাকলে এসব ভুলভ্রান্তি এড়িয়ে শুদ্ধ ও নির্ভুলরূপে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায়।
- বাংলা ব্যাকরণ বাংলা শব্দ ও বাক্যের প্রমিত বানান ও উচ্চারণরীতি শেখায়। পরিশীলিত উচ্চারণ ও প্রমিত বানান জানার জন্য বাংলা ব্যাকরণে জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যিক।
- বাংলা ভাষার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পরিণতি, ভাষাপরিবার, সাহিত্যের সঙ্গে এর সংশ্লিষ্টতা প্রভৃতি তত্ত্ব ও তথ্য জানতে আমাদের বাংলা ব্যাকরণের দারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।।
- বাংলা ভাষাকে সৌন্দর্যমন্ডিত, সুষ্ঠু সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য বাংলা ব্যাকরণ জানা আবশ্যিক।
- বাংলা বাক্যের বিভিন্ন উপাদান ও অংশের পরিচয়, ছন্দ অলঙ্কার নির্ণয়, বিভিন্ন ভাষারীতির পরিচয় প্রভৃতি জানতে হলে বাংলা ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।
- সঠিক শব্দ চয়ন, সুষ্ঠু বাক্যবিন্যাস, বিভিন্ন পদের গঠন কাঠামো, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দ বা বাক্যের অর্থ বিচার প্রভৃতি জানার জন্য বাংলা ব্যাকরণ পাঠ গুরুত্বপূর্ণ।
- বাংলা ভাষার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধান ও খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য ও তথ্য উপাত্ত জানতে বাংলা ব্যাকরণ মূল আশ্রয়।

পরিশেষে বলা চলে, বাংলা ব্যাকরণ বাংলা ভাষার সংবিধান। বাংলা ভাষার সঙ্গে বাংলা ব্যাকরণ তাই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাংলা ভাষা বিষয়ক যাবতীয় বিষয় জানতে বাংলা ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য।

অধ্যায়
০২

বাংলা ভাষা



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	১	—	—
২০২৩	১	১	—
২০২২	—	২	১



"আমার মুখের বসন্তের দিন চলে যেতে পারে, কিন্তু আমার
বাংলা-ভাষা-র উপর আমার ভালোবাসা চিরদিন থাকবে"



কাজী নজরুল ইসলাম

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। চলিত ভাষায় কোন শব্দের প্রাধান্য বেশি?

[বাকাশিবো ১৩]

উত্তর: চলিত ভাষায় তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দের প্রাধান্য বেশি।

২। বাংলা ভাষাকে কী কী উপভাষায় বিভক্ত করা যায়?

[বাকাশিবো ১৩]

উত্তর: উত্তরবঙ্গীয়, রাজবংশীয়, পূর্ববঙ্গীয় ও দক্ষিণবঙ্গীয় উপভাষায়।

৩। মৌখিক ভাষা কত প্রকার ও কী কী?

[বাকাশিবো ১২]

উত্তর: মৌখিক ভাষা দুই প্রকার। যথা-

(১) আঞ্চলিক ভাষা ও

(২) সার্বজনীন কথ্য ভাষা।

৪। ‘আলালের ঘরের দুলাল’ গ্রন্থের রচয়িতা কে? তার ছদ্মনাম কী?

[বাকাশিবো ১১]

উত্তর: প্যারীচাঁদ মিত্র। তার ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর।

৫। সার্বজনীন কথ্য ভাষা বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো ২৩,২৪]

উত্তর: সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য ভাষাকে সার্বজনীন কথ্য ভাষা বলে।

৬। সংস্কৃতি বলতে কী বুঝায়?

[বাকাশিবো ০৪]

উত্তর: সংস্কৃতি বলতে কোনো সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, খাদ্যাভ্যাস, জীবনাচারসহ যাবতীয় কাজকর্মকে বুঝায়।

৭। উপভাষা কাকে বলে? অথবা, আঞ্চলিক ভাষা কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ০২]

উত্তর: কোনো বিশেষ অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের লক্ষ্যে সাধারণত যে ভাষায় কথা বলে থাকে, তাকে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা বলা হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সংস্কৃতি কাকে বলে? সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি কী?

[বাকাশিবো: ২২,১১]

উত্তর: কোনো সমাজের মানুষের চাল-চলন, কথা-বার্তা, আদব-কায়দা, ভাষা-সাহিত্য, ওঠা-বসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবকিছুর সমন্বিত রূপকে বলে সংস্কৃতি। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণশক্তি হলো ভাষা।

২। সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

[বাকাশিবো - ১২,১৩]

উত্তর: সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হলো:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
১। সাধু ভাষা গুরুগম্ভীর।	১। চলিত ভাষা সহজ-সরল।
২। সাধু ভাষায় সর্বনামের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়।	২। চলিত ভাষায় সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয়।
৩। সাধু ভাষায় তৎসম শব্দের ব্যবহার হয়।	৩। চলিত ভাষায় তৎসব ও দেশি শব্দের ব্যবহার হয়।
৪। সাধু ভাষায় হইতে, দিয়া অনুসর্গের ব্যবহার হয়।	৪। চলিত ভাষায় হতে, দিয়ে ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার বেশি হয়।
৫। সাধু ভাষা দুস্পরিবর্তনীয়।	৫। চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল।
৬। সাধু ভাষায় ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ প্রকাশিত হয়।	৬। চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয়।
৭। এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে অনুপযোগী ভাষা।	৭। এটি নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার ক্ষেত্রে উপযোগী ভাষা।
৮। সাধু ভাষায় পদবিন্যাস সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত।	৮। চলিত ভাষার পদবিন্যাস সর্বদা সুনিয়ন্ত্রিত নয়।
৯। সাধু ভাষা সম্পূর্ণভাবে ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলে।	৯। চলিত ভাষা সম্পূর্ণরূপে ব্যাকরণের নিয়মকে মেনে চলে না।
১০। সাধু ভাষা প্রাচীন।	১০। চলিত ভাষা আধুনিক।

৩। "আঞ্চলিক ভাষাও সাহিত্য-শিল্পের বাহন হতে পারে"- আলোচনা কর।

[বাকাশিবো : ২২ ০২, ০৭, ০৮]

উত্তর: রূপভেদের জন্য আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সর্বজনীন স্বীকৃতি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। তবুও সেই চর্যাপদ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সাহিত্য সৃষ্টিতে এর প্রভাব দেখা যায়। দীনবন্ধুমিত্রের 'নীল দর্পণ', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি', শহীদুল্লাহ কায়সারের 'সারেং বৌ' প্রভৃতি নাটক ও উপন্যাসে আমরা আঞ্চলিক ভাষার কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। চরিত্রগুলোকে স্বাভাবিক করার তাগিদে এ রীতির ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলাদেশের আধুনিক লেখকগণও গ্রাম্যজীবনের কাহিনীতে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। যেমন- সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ নোয়াখালির আঞ্চলিক ভাষা, আবু ইসহাক বিক্রমপুরের আঞ্চলিক ভাষা এবং শওকত ওসমান চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এদের আলোচনায় দেখা যায় আঞ্চলিক ভাষা সাহিত্য-শিল্পের বাহন হতে পারে এবং ভাবের আদান-প্রদান কার্যকর ও সুষ্ঠু হয়। কারণ আঞ্চলিক ভাষার-ও রয়েছে পরিবেশের ভিন্নতা অনুযায়ী পর্যাপ্ত শব্দ সম্পদ ও অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

৪। সাধু ভাষা হতে চলিত ভাষায় রূপান্তর-এর চারটি নিয়ম লিখ। বাকাশিবো-২০২৩ ০২, ০৬]

উত্তর: সাধু ভাষা হতে চলিত ভাষার রূপান্তর করার চারটি নিয়ম নিম্নরূপ:

- (১) সর্বনাম পদকে সংক্ষিপ্ত করে। যেমন- তাহার - তার
- (২) ক্রিয়াপদকে সংক্ষিপ্ত করে। যেমন- করিয়া - করে
- (৩) অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ করে। যেমন- হইতে - হতে
- (৪) তৎসম শব্দের পরিবর্তে তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করে। যেমন- চন্দ্র - চাঁদ

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য আলোচনা কর।

[বাকশিবো ০৭]

উত্তর: সাধু ও চলিত রীতির পার্থক্য ব্যবহার ও লেখার বিচারে বাংলা ভাষা দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়।

যথা: সাধুরীতি ও চলিতরীতি। নিচে এদের পার্থক্য দেয়া হলো:

পার্থক্যের বিষয়	সাধু ভাষা	সাধু ভাষা
১. সংজ্ঞা	পণ্ডিতগণ বাংলা ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী যে ভাষায় সাহিত্য রচনা করেন তার নাম সাধু ভাষা।	যে ভাষায় কথাবার্তা বলা হয় তাকে চলিত ভাষা বলে।
২. ব্যাকরণগত	বাংলা লেখ্য সাধু ভাষা ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে চলে।	চলিত ভাষা ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না।
৩. পদবিন্যাস	এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট।	এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট নয়।
৪. কাঠামোগত	সাধু ভাষার কাঠামো সাধারণত অপরিবর্তনীয়।	চলিত ভাষার কাঠামো সাধারণত পরিবর্তনশীল।
৫. প্রকৃতিগত	ইহা গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল।	এ ভাষা গাম্ভীর্য বর্জিত, সরল ও তদ্ভব শব্দবহুল।
৬. সংলাপ	সাধুভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার অনুপযোগী।	চলিত ভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার উপযোগী।
৭. শ্রুতিগত	সাধুভাষা শ্রুতিকঠোর ও দুর্বোধ্য।	চলিত ভাষা শ্রুতিমধুর ও সহজবোধ্য।
৮. গঠনগত	সাধুভাষা কৃত্রিমতাপূর্ণ।	বর্জিত চলিত ভাষা কৃত্রিমতা
৯. গতিশীলতা	সাধুভাষা গতিশীল নয়।	চলিত ভাষা গতিশীল।
১০. জীবনগত	সাধুভাষা নীরস ও প্রাণহীন।	চলিত ভাষা সরস ও প্রাণবন্ত।

২। বাংলা সাহিত্যকে কয়টি যুগে ভাগ করা যায়? কী কী? প্রত্যেক যুগের বিস্তারিত আলোচনা কর।

উত্তর: বাংলা সাহিত্যকে ২টি যুগে ভাগ করা যায়।

[বাকশিবো-২০২২]

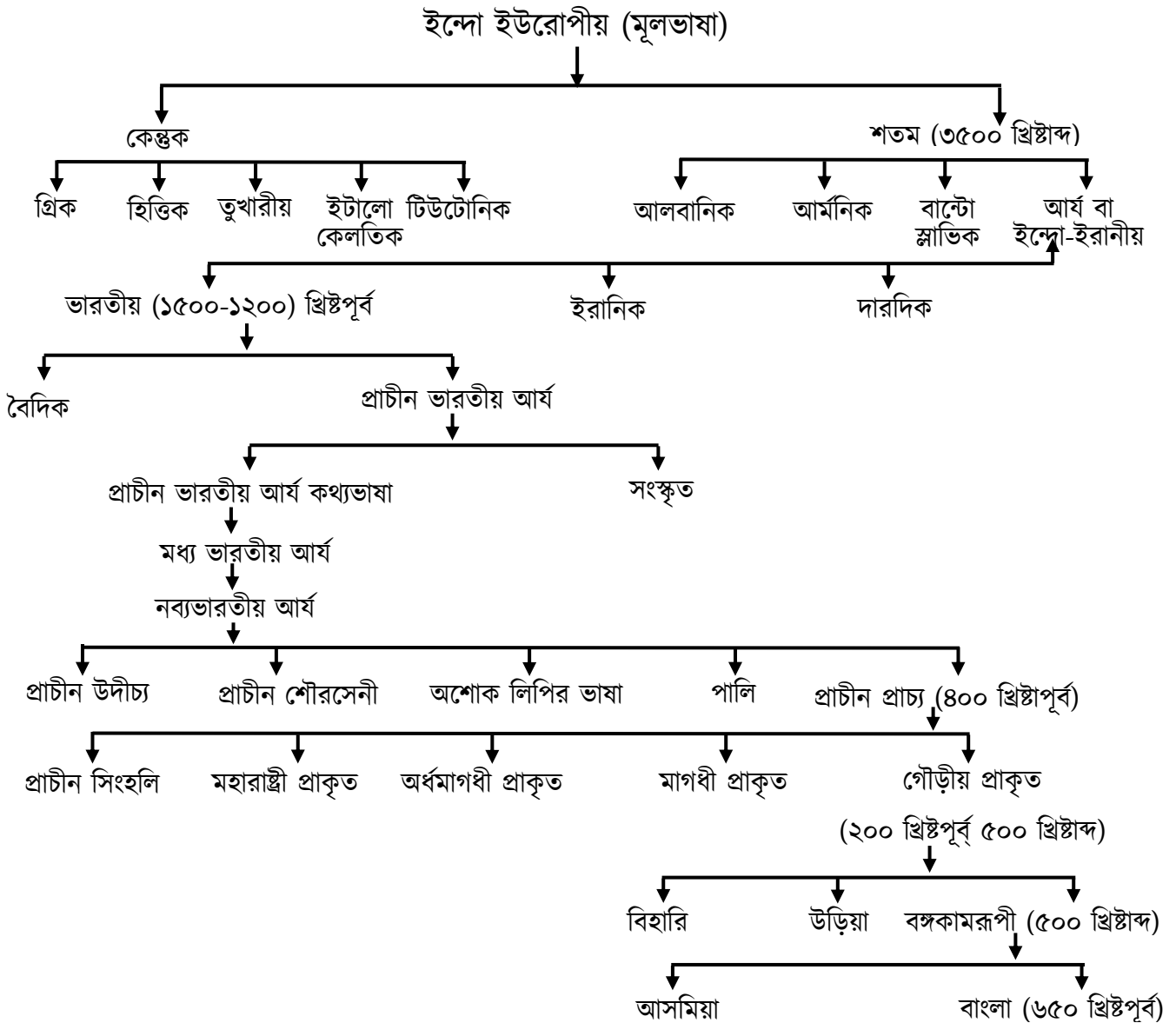
ক. প্রথম পর্যায়-পালি ভাষা (খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ অব্দ পর্যন্ত)।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়-প্রাকৃত ভাষা (খ্রিষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত)।

অঞ্চলভেদে প্রাকৃতের চারটি প্রধান ভাগ রয়েছে। যথা:

- শৌরসেনী প্রাকৃত।
- মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত।
- মাগধী প্রাকৃত।
- অর্ধমাগধী বা জৈন প্রাকৃত।

❖ বাংলা ভাষার বংশ তালিকা :



পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার উৎপত্তি অল্প সংখ্যক মূল ভাষা থেকে। এদের মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে 'ইন্দো-ইউরোপীয়' বা 'আদি আর্য ভাষাগোষ্ঠী'। বাংলা ভাষাভাষী জনগণ প্রথম থেকেই বাংলায় কথা বলত না। এর সুদীর্ঘ বিবর্তনের ধারা ও ইতিহাস আছে। বাংলা ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিষ্টপূর্ব আনুমানিক পাঁচহাজার বছর আগে এই মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে জন্ম হয় দুইটি ভাষা কেন্দ্রম ও শতম। আনুমানিক আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে মূলভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেসব প্রাচীন শাখার সৃষ্টি হয়, তার অন্যতম হলো আর্য শাখা। এ আর্য ভাষা থেকেই ভারতীয় আর্যভাষার সৃষ্টি (১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। যার থেকে সৃষ্টি হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা,

আর এই প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার রয়েছে তিনটি স্তর।

ক. প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষা

খ. মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা

গ. নব্য ভারতীয় আর্যভাষা

মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পরবর্তী স্তর হলো নব্যভারতীয় আর্যভাষা। কিন্তু নিয়মকানুনের শিথিলতা ও উচ্চারণ বিকৃতির ফাঁকে ধীরে ধীরে ভারতীয় অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। এভাবে গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বঙ্গকামরূপী হয়ে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। এ পর্যায়ের অন্যান্য ভাষা হলো বিহারি, উড়িয়া, অসমিয়া। বাংলা ভাষার উৎপত্তির পর এতে যে পরিবর্তন ও রূপান্তর ঘটেছে, তা তিনটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। যথা:

১. আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ: খ্রিষ্টীয় সপ্তম বা দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগ বিস্তৃত। এ যুগের বাংলা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় 'চর্যাপদে'।
২. মধ্যযুগ: খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগ বিস্তৃত। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে এ যুগের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। এছাড়া এ যুগের বিভিন্ন সময়ের ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গল কাব্য, প্রণয়োপাখ্যান প্রভৃতি সাহিত্যে।
৩. আধুনিক যুগ: খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের সাহিত্য কর্মে। তাছাড়া এ পর্যায়ের বাংলা আমাদের ব্যবহারিক ভাষা। অর্থাৎ আমরা আধুনিক যুগের বাংলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত।

অধ্যায়
০৩

বাংলা ধ্বনিত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	—	২	—
২০২৩	—	১	১
২০২২	২	৩	১



“হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন।”



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। স্পর্শ বর্ণ কোনগুলো?

[বাকাশিবো: ১৩]

উত্তর: 'ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত বর্ণগুলো স্পর্শ বর্ণ।

২। যুক্তবর্ণ কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ২২]

উত্তর: দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলে একটি বর্ণে পরিণত হওয়াকে যুক্তবর্ণ বলে।]

যেমন- ক + ক = ক্ক।

৩। বর্ণ কয়টি ও কী কী?

[বাকাশিবো: ১১]

উত্তর: বর্ণ ৫টি। যথা- ক-বর্ণ, চ-বর্ণ, ট-বর্ণ, ত-বর্ণ, প-বর্ণ।

৪। দ্বিস্বর বা যৌগিক স্বরধ্বনি কাকে বলে?

[বাকাশিবো: ৯৭, ৯৯, ১১]

উত্তর: যে সকল স্বরধ্বনি দুটি স্বরধ্বনির যুক্তরূপ তাদেরকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলে।

৫। অঘোষ ব্যঞ্জন ধ্বনি কাকে বলে? -

[বাকাশিবো: ২২]

উত্তর: যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ব্যঞ্জন ধ্বনি, যথা: প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ, হ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। আধুনিক বাংলা বানানের দুটি নিয়ম লেখ।

[বাকাশিবো: ২২, ২৪]

উত্তর: নিম্নরূপ: আধুনিক বাংলা বানানের দুটি নিয়ম নিম্নরূপঃ

(১) স্ট্রীলিঙ্গ, জাতি, ভাষা, ব্যক্তি ও বিশেষণ বাচক শব্দের শেষে-কার ব্যবহৃত হয়। যেমন- হিন্দী, জাপানী, তুর্কী, ইংরেজী ইত্যাদি।

(২) আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় কিছু শব্দে ঙ্গ-কার হবে। যেমন- ঙ্গদ, ঙ্গমান, মীর, শরীফ, গরীব, কাযী ইত্যাদি।

২। মৌলিক স্বরধ্বনি কাকে বলে? মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী? [বাকাশিবো: ১৩]

উত্তর: যে সব স্বরধ্বনি এককভাবে উচ্চারিত হতে পারে তাকে মৌলিক স্বরধ্বনি বলে। মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি। যথা- অ, আ, ও, ই, উ, এ, এ্যা।

৩। পার্শ্বিক ধ্বনি কী? এবং পার্শ্বিক ধ্বনি কোনটি? [বাকাশিবো: ২২]

উত্তর: যে ধ্বনি উচ্চারণকালে ফুসফুসতাড়িত বাতাস জিহ্বাবার দুই পাশ দিয়ে বের হয় তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যেমন- "ল"।

৪। ধ্বনি ও বর্ণ ভিন্ন জিনিস- অর্থ কী? অথবা, বর্ণ কাকে বলে? ধ্বনির সাথে বর্ণের পার্থক্য কী?

[বাকাশিবো: ২৪, ২৩, ২২]

উত্তর: সাধারণত কোনো আওয়াজ বা শব্দকে ধ্বনি বলে। কিন্তু ব্যাকরণের ভাষায় মানুষের কণ্ঠনিসৃত অর্থবোধক শব্দ বা আওয়াজকে ধ্বনি বলে। ধ্বনিকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। সুতরাং সংজ্ঞা থেকেই বুঝা যাচ্ছে ধ্বনি ও বর্ণ ভিন্ন জিনিস। একটি হচ্ছে মৌখিক রূপ আর একটি লিখিত রূপ। ধ্বনি হচ্ছে মৌখিক রূপ আর বর্ণ হচ্ছে ধ্বনির লিখিত রূপ।

৫। ষ-ত্ব বিধানের ২টি বিধান লিখ।

উত্তর: ষ-ত্ব বিধানের ২টি নিয়ম:

(১) ঋ, র-এর পর তৎসম শব্দে 'য' হয়। যেমন- কৃষি, বর্ষা ইত্যাদি।

(২) ট বর্ণের সঙ্গে 'য' যুক্ত হয়। যেমন- কাষ্ঠ, নিষ্ঠা ইত্যাদি।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। প্রমিত বাংলা বানান নিয়ম বলতে কী বুঝায়? এই বানান নিয়ম সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

[বাকশিবো: ২২,২৩]

উত্তর: বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম:

❖ আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম:

বানানকে বাদ দিয়ে ভাষা শেখা সম্ভব নয়। শুদ্ধ বানান লেখা ভাষা শিক্ষার একটা প্রধান শর্ত। বাংলা বানানের ক্ষেত্রে আমরা নানা সমস্যা ও জটিলতার সম্মুখীন হই। আমাদের বানানের অসুবিধার কারণ এই যে আমাদের ভাষায় শব্দ নানা জায়গা থেকে এসেছে। আমাদের ভাষায় সংস্কৃত শব্দ আছে, আরবি-ফারসি শব্দ আছে, ইংরেজি-পর্তুগিজ-ওলান্দাজ ভাষার শব্দ আছে, আবার দেশি শব্দও আছে। এর ফলে বানানের নিয়মও রকমারি হয়ে গেছে।

❖ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মাবলি

তৎসম শব্দ

তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এইসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে। তবে যে-সব তৎসম শব্দে ই ঙ্গ বা উ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন, ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্গা, উষা। রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ষিক্য, বার্তা, সূর্য। সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। তবে অঙ্ক, অঙ্গ, আকাজক্ষা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ্গ স্থানে ং হবে না।

নিম্নে কিছু নিয়ম দেওয়া হলো:

১। হ্রস্ব-ই কার ও দীর্ঘ-ঈ কার ব্যবহারের নিয়ম

(১) যে সব শব্দ বিদেশি ভাষা থেকে এসেছে সেগুলো তৎসম নয়, অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ নয় সেগুলোর বানানে হ্রস্ব-ই কার হয়। যেমন- খুশি, আসামি, ফরিয়াদি, ফাঁসি, দাবি, বেশি ইত্যাদি। তদ্ভব ও অর্ধতৎসম শব্দে হ্রস্ব-ই কার হবে। যেমন-বাড়ি, আশি, হাতি, বাটি, লাঠি, বাতি ইত্যাদি।

(২) বাংলা ভাষায় এমন এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বিশেষণ এবং এসব শব্দের শেষে দীর্ঘ-ই কার হয়। যেমন- স্থায়ী, একাকী, দায়ী, উপযোগী, প্রতিযোগী, উপকারী, প্রতিদ্বন্দী, কৃতী ইত্যাদি। এসব শব্দের শেষে 'ত্ব' বা 'তা' যোগ করে বিশেষ পরিবর্তন করতে হলে দীর্ঘ-ই কার হ্রস্ব-ই কার হয়ে যায়। যেমন- স্থায়িত্ব, দায়িত্ব, কৃতিত্ব, প্রতিযোগিতা, উপযোগিতা, একাকিত্ব, উপকারিতা ইত্যাদি।

(৩) সংস্কৃত নিয়মে যে সব শব্দের শেষে 'ইন' থাকে সে সব শব্দের সঙ্গে 'তা' বা 'ত্ব' যোগ হলে কিংবা সন্ধি বা সমাস হলে হ্রস্ব-ই কার হয়। যেমন- প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিগণ, পক্ষী---পক্ষিশাবক, মন্ত্রী---মন্ত্রিসভা।

প্রশ্নসূচক অব্যয়-এর ক্ষেত্রে-ই-কার ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্নসূচক সর্বনামের ক্ষেত্রে-ঈ-কার ব্যবহার হয়।

(৪) বাংলায় যে সব শব্দ 'তি' দিয়ে শেষ হয় সেগুলোতে হ্রস্ব-ই-কার হয়। যেমন- ক্ষতি, ইতি, পতি, বিরতি, নীতি, রাতি, আকৃতি, স্মৃতি ইত্যাদি।

স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে দীর্ঘ-ঈ-কার হয়। যেমন- সতী, শ্রীমতী, সালতী, কেশবতী ইত্যাদি।

ভাষা, জাতি ইত্যাদি লিখতে দীর্ঘ-ঈ-কার হবে।

(৫) শেষে 'ত' বা 'হিত' দিয়ে যে সব শব্দের বিশেষণ করা হয় সেসব শব্দে 'ত' এর আগে হ্রস্ব-ই-কার হয়।

যেমন- খণ্ডিত, শিক্ষিত, নিয়মিত, লিখিত, সঞ্চিত, চিন্তিত, ভাবিত, গর্বিত, হরষিত, চমকিত ইত্যাদি।

আবার কয়েকটি শব্দে ব্যতিক্রম আছে। যেমন- অতীত, অধীত, বিক্রীত, ব্যতীত ইত্যাদি।

'এ'-ধ্বনির এই বিবৃত উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

ক. দুই-অক্ষরবিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে যেমন: এত, হেন, কেন, এখন ইত্যাদি। কিন্তু ব্যতিক্রম: যেথা, সেথা, হেথা।

খ. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দুযুক্ত ধ্বনির আগে এ-ধ্বনি বিবৃত। যেমন: খেড়া, চেংড়া, গেঁজেল, স্যাঁতসেঁতে।

গ. খাঁটি বাংলা শব্দে; যেমন: খেমটা, টেপসা, তেলাপোকা, দেওর, তেনা, দেওর। দয়

ঘ. 'এক', এগারো, 'তেরো' প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দে এবং 'এক' যুক্ত শব্দেও। যেমন: একতলা, একচোট, একঘরে ইত্যাদি।

ঙ. ক্রিয়াপদের বর্তমান কালের অনুজ্ঞায় 'তুচ্ছার্থ ও সাধারণ মধ্যম পুরুষ রূপে; যেমন দেখ (দ্যাখ), দেখ (দ্যাখো), জে (খ্যাল), খেল (খ্যালো), ফেল্ (ফ্যাল), ফেল (ফ্যালো) ইত্যাদি।

'ঐ': 'ঐ' ধ্বনিটি একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই কিংবা ও + ই = অই, ওই। অ এবং ই- এ দুটো স্বরের মিলিত ধ্বনিতে 'ঐ' ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন: ক্ + অ + ই = কই, কৈ; ব + ই + ধ বৈধ ইত্যাদি। এরূপ-ঐক্য, চৈতন্য, বৈদেশিক।

'ও': বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-কার দীর্ঘ হয়। যেমন: গো, জোর, রোগ, বোন, কোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব হয়। যেমন। 'কারো', 'পুরোভাগ' (সোনা)। ও-এর উচ্চারণ ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

২। উচ্চারণের স্থান অনুসারে বর্ণীয় বর্ণের শ্রেণিবিভাগ দেখাও-

[বাকশিবো: ২৩]

উত্তর: উচ্চারণের স্থান অনুসারে বর্ণীয় বর্ণগুলি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত: কণ্ঠ্য (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), তালব্য (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ), মূর্ধন্য (ট, ঠ, ড, ঢ, ণ), দন্ত্য (ত, থ, দ, ধ, ন), এবং ওষ্ঠ্য (প, ফ, ব, ভ, ম)। প্রতিটি ভাগে পাঁচটি করে বর্ণ রয়েছে, এবং প্রতিটি বর্ণের নামকরণ করা হয় তার প্রথম বর্ণটির নাম অনুসারে।

বর্গীয় বর্ণের শ্রেণীবিভাগ:

ক-বর্গীয় ধ্বনি: ক, খ, গ, ঘ, ঙ - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণ জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি।

চ-বর্গীয় ধ্বনি: চ, ছ, জ, ঝ, ঞ - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

গ-বর্গীয় ধ্বনি: ট, ঠ, ড, ঢ, ণ - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ উল্টিয়ে ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশকে স্পর্শ করে। এগুলোর উচ্চারণে জিহ্বা উল্টা হয় বলে এদের নাম দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। আবার এগুলো ওপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধায় স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের বলা হয় মূর্ধন্য ধ্বনি।

ঘ ত-বর্গীয় ধ্বনি: ত, থ, দ, ধ, ন - এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

প-বর্গীয় ধ্বনি: প, ফ, ব, ভ, ম -এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠের সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের ওষ্ঠাধ্বনি বলে।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের স্থানের ভিন্নতা এবং উচ্চারণস্থানের নাম অনুসারে বর্ণগুলো কণ্ঠ্যবর্ণ, তালব্য বর্ণ, ওষ্ঠ্যবর্ণ প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত করা যায়।

নিচে ছকের সাহায্যে স্বরবর্ণগুলোর নাম ও উচ্চারণস্থান নির্দেশ করা হলো:

উচ্চারণস্থান অনুসারে বর্ণের নাম	উচ্চারণস্থান	বর্ণ
কণ্ঠ্যবর্ণ	কণ্ঠ	অ, আ
তালব্যবর্ণ	তালু	ই, ঈ
ওষ্ঠ্যবর্ণ	ওষ্ঠ্য	উ, ঊ
মূর্ধন্যবর্ণ	মূর্ধা	ঋ
কণ্ঠ্যতালব্যবর্ণ	কণ্ঠ ও তালু	এ, ঐ
কণ্ঠ্যওষ্ঠ্যবর্ণ	কণ্ঠ ও ওষ্ঠ্য	ও, ঔ

অধ্যায়
০৪

রূপতত্ত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন । নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	১	১	—
২০২৩	—	১	—
২০২২	—	১	—



"বিদ্যা হলো সব থেকে বড় সম্পদ"



ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। 'চোখ' শব্দের ৪টি প্রতিশব্দ লেখ।

[বাকাশিবো ২৪, ১৩]

উত্তর: (১) চক্ষু (২) আঁখি (৩) অক্ষি এবং (৪) নয়ন।

২। ই-কার ও ঈ-কার ব্যবহারের একটি করে নিয়ম লেখ।

[বাকাশিবো: ১২]

উত্তর: ই-কার: শব্দের শেষে ইক, ইকা, ইতা এসব থাকলে সেখানে হ্রস্ব-ই-কার হবে। যেমন-
নাবিক, আর্থিক, মানবিক ইত্যাদি।

ঈ-কার: স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। যেমন- সতী, কেশবতী ইত্যাদি।

৩। শুদ্ধ করে লেখো: জিবীকা, ন্যাস্ত, মনিষী, সম্মান।

[বাকাশিবো: ১২]

উত্তর: জিবীকা = জীবিকা

ন্যাস্ত = ন্যাস্ত

মনিষী = মনীষী

সম্মান = সম্মান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বানানের শুদ্ধ রূপটি লেখ।

[বাকাশিবো: '১১]

উত্তর: সর্বজনীন- সর্বজনীন

অশেষ- অশেষ

আনুসঙ্গিক- আনুষঙ্গিক

বিপনি- বিপণি

কৃসকগণ কৃষকগণ

২। আধুনিক বাংলা বানানের তিনটি নিয়ম উল্লেখ কর।

[বাকাশিবো: ২২, ২৩, ২৪]

উত্তর: আধুনিক বাংলা বানানের তিনটি নিয়ম নিম্নরূপ:

- (১) জাতিবাচক শব্দে কেবল ই-কার (ি) হবে। যেমন- বাঙালি, জাপানি, চিনা ইত্যাদি।
- (২) 'আলি' প্রত্যয়ান্ত শব্দে ই-কার (ি) হবে। যেমন- সোনালি, মিতালি, রূপালি ইত্যাদি।
- (৩) অ-তৎসম শব্দে মূর্ধন্য 'ণ' হবে না। যেমন- কোরান, মর্ডান, নকল ইত্যাদি।

৩। বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের তিনটি নিয়ম লেখ।

[বাকাশিবো: ১১]

উত্তর: বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের তিনটি নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হলো:

- (১) তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এসব শব্দের বানান ও ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে।
- (২) তবে যে-সব তৎসম শব্দে ই, ঈ বা উ, উ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার কার চিহ্ন, ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিংকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।
- (৩) রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ষিক্য, বার্তা, সূর্য।

অধ্যায়
০৫

বাক্যতত্ত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	—	—	—
২০২৩	—	—	—
২০২২	—	—	০১



“এককালে পৃথিবী বইয়ের উপর কাজ করত, এখন বই-ই
পৃথিবীর উপর কাজ করে”



-জুবার্ট

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। বাক্যের অংশ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: একটি বাক্যের দু'টি অংশ থাকে। যথা-(১) উদ্দেশ্য ও (২) বিধেয়।

২। বাক্যের উদ্দেশ্য কাকে বলে? বুঝিয়ে বল।

উত্তর: উদ্দেশ্য: বাক্যে যাকে উদ্দেশ্য করে বা যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন-
“পলি নিয়মিত কলেজে যায়।” -এ বাক্যে ‘পলি’র দ্বারা কলেজে যাওয়া সম্পাদিত হয় বলে ‘পলি’
উদ্দেশ্য। বাক্যের কর্তা উদ্দেশ্য অংশে থাকে।

৩। জটিল বাক্য কাকে বলে? সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দাও।

উত্তর: জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ড বাক্য থাকে এবং এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ড
বাক্য থাকে তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে।

যেমন: যদি সে আসে তবে আমি যাব, যারা ভালো ছেলে তারা নিয়মিত পড়াশুনা করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। গঠনের দিক থেকে বাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? কী কী?

উত্তর: গঠন অনুসারে বাংলা বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- (১) সরল বাক্য
- (২) জটিল বা মিশ্র বাক্য
- (৩) যৌগিক বাক্য

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

২। একটি সার্থক বাক্যের কয়টি গুণ থাকে? কী কী? আলোচনা কর। [বাকাশিবো: ২০২২]

উত্তর: একটি সার্থক বাক্য গঠন করতে হলে তার মধ্যে তিনটি গুণ থাকতে হবে।

যেমন: (১) আকাঙ্ক্ষা (২) আসত্তি বা নৈকট্য ও (৩) যোগ্যতা।

এর মধ্য থেকে কোন একটি গুণ বাদ পড়লে তাকে সার্থক বাক্য বলা যাবে না।

(১) আকাঙ্ক্ষা: বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝার জন্য এক পদ শোনার পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা তাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে।

যেমন- ‘আশিক নিয়মিত ভাত’ একই বাক্যটি বললে বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। আরো কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষা থেকে যায়। সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হলে বাক্যটি এভাবে সাজাতে হবে- “আশিক নিয়মিত ভাত খায়।”

তাহলেই আমরা বাক্যটিকে আকাঙ্ক্ষা পূরণ সাপেক্ষে সার্থক বাক্য বলবো।

(২) আসত্তি: বাক্যের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য সুশৃংখল পদ বিন্যাসকেই আসত্তি বলে। অর্থ বাক্যের অর্থ যথাযথভাবে প্রকাশের জন্য যে পদের পর যে পদ বসানো প্রয়োজন ঠিক সেভাবেই সাজিয়ে পদ বসানোর প্রক্রিয়াকেই আসত্তি বলে। যেমন- “সোনার বাংলা আমার আমি ভালোবাসি তোমায়। “বাক্যটিতে পদ বিন্যাস যথাযথ হয়নি বলে এটি সঠিক বাক্য নয়। সঠিক বাক্য হতে হলে পদ বিন্যাস করতে হবে-

“আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। “

তাহলেই আমরা বাক্যটিকে আসত্তি পূরণ সাপেক্ষে সার্থক বাক্য বলবো।

(৩) যোগ্যতা: বাক্যে ব্যবহৃত পদগুলোর মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত মিলন বন্ধনকেই যোগ্যতা বলে। যেমন “গরু আকাশে উড়ে। “উল্লেখিত বাক্যটির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি পূরণ যথাযথভাবে হলেও এটি সার্থক বাক্য নয়। কেননা এই বাক্য ব্যবহৃত পদগুলোর মধ্যে অর্থগত ও ভাবগত মিলন বন্ধনের অভাব রয়েছে। কারণ ‘গরু’ একটি চার পায়ের প্রাণী। গরু কখনো আকাশে উড়তে পারে না। সেজন্য বাক্যটি ভাব প্রকাশে যোগ্যতা হারিয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয় “পাখি আকাশে উড়ে।” তাহলে বাক্যটি যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে একটি সার্থক বাক্য।

অধ্যায়
০৬

বাক্য সংকোচন, বাগধারা, প্রবাদ প্রবচন

এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	—	—	—
২০২৩	—	—	—
২০২২	—	—	—



যাঁরা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয় তাঁরা হয় বাংলা
জানেননা অথবা বিজ্ঞান বোঝেন না।



-সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বাক্য সংকোচন

রচনার ভাষা সুন্দর, সুস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর করার জন্য বক্তব্যের বিষয় স্বল্প কথায় প্রকাশ করতে হয়। আর এই অল্প কথায় প্রকাশ করাকে এককথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন বলে। বাক্য সংকোচনের অন্য নাম বাক্য সংহতি বা একপদে পরিণতকরণ। যেমন: জ্বল জ্বল করছে যা- জাজ্বল্যমান, উপকারীর উপকার করার ইচ্ছা- উপচিকীর্ষা।

সুতরাং বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করার জন্য বাক্যের বহুপদকে এক পদে পরিণত করাকে বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ বলে।

■ বাক্য সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা

বাক্য সংকোচনের প্রয়োজনীয়তাগুলো আমরা এভাবে লিখতে পারি:

১. বাক্যের ও বিষয়ের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য বাক্য সংকোচন আবশ্যিক।
২. বাংলা ভাষায় কোনো রচনাকে সুন্দর ও সুস্পষ্ট করতে বাক্য সংকোচনের প্রয়োজন।
৩. দীর্ঘ বা প্রসারিত কোনো বক্তব্য বা বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করার ক্ষেত্রে বাক্য সংকোচন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৪. রচনার চমৎকারিত্ব সৃষ্টি ও ভাবের সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য বাক্য সংকোচন আবশ্যিক।
৫. বাক্য বা রচনা সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করতে বাক্য সংকোচনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

■ বাক্য সংকোচনের উপায়

বাক্য সংকোচন পাঁচটি উপায়ে সাধিত হতে পারে। যেমন: ১. সমাসের সাহায্যে, ২. কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে, ৩. তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে, ৪. উপসর্গের সাহায্যে, ৫. ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে। :

১. সমাসের সাহায্যে : অন্য দেশ- দেশান্তর (নিত্য সমাস)
: পল মিশ্রিত অনু-পলান্ন (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস) ।
২. কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে : ঘুমিয়ে আছে এমন- ঘুমন্ত ।
৩. তদ্ধিত প্রত্যয়ের সাহায্যে : পাগলের ভাব পাগলামি ।
৪. উপসর্গের সাহায্যে : ধন নেই যার – নির্ধন (সংস্কৃত উপসর্গ) ।
৫. ভিন্ন শব্দ প্রয়োগে : উই মাটির ঢিবি- বল্মীক ।

■ বাক্য সংকোচনের কতিপয় উদাহরণ:

অ

অকালে পক্ক হয়েছে যা — অকালপক্ক
অহংকার নেই যার — নিরহংকার
অতি কষ্টে যা নিবারণ করা যায় — দুর্নিবার
অন্ত নেই যার — অনন্ত
অন্য গাছের উপর জন্মে যে গাছ — পরগাছা
অনেকের মধ্যে একজন — অন্যতম
অগ্রে গমন করে যে — অগ্রগামী, অগ্রবর্তী
অক্ষর জ্ঞান নেই যার — নিরক্ষর
অতি শীতও নয় উষ্ণও নয় — নাতিশীতোষ্ণ
অপকার করার ইচ্ছা — অপচিকীর্ষা
আড় চোখে দৃষ্টিপাত — কটাক্ষ

আ

আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে যার — আস্তিক
আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস নেই যার — নাস্তিক
আয়বুঝে যিনি ব্যায় করেন — মিতব্যয়ী
আত্মার সাথে সম্পর্কযুক্ত — আত্মীয়
আশ্রয় নেই যার — নিরাশ্রয়
আজন্ম শত্রু — জাতশত্রু
আকাশে চরে বেড়ায় যে — আকাশচারী/খেচর
আঘাতের বদলে আঘাত — প্রতিঘাত
আবহমান কাল ধরে যা প্রচলিত — চিরায়ত

ই

ইতিহাস রচনা করেন যিনি — ঐতিহাসিক
 ইমান নেই যার — বেইমান
 ইতোপূর্বে দণ্ডিত ব্যক্তি — দাগী
 ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি — ইতিহাসবেত্তা
 ইচ্ছার অধীন — ঐচ্ছিক
 ইন্দ্রকে যিনি জয় করেছেন — ইন্দ্রজিৎ

ঈ

ঈষৎ রুগ্ণ — রোগাটে
 ঈশ্বর বিষয়ক — ঐশ্বরিক
 ঈষৎ পান্ডুর বর্ণ — ধূসর
 ঈশ্বর প্রেরিত দূত — পয়গম্বর
 ঈষৎ শিক্ষিত — অল্পবিদ্যা
 ঈষৎ আমিষ (আঁষ) গন্ধ যার — আঁষটে

উ

উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগের ক্ষমতা — প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব
 উচিত নয় যা — অনুচিত
 উপকারীর যে অপকার/ক্ষতি করে — কৃতঘ্ন।
 উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে যার — উচ্চাকাঙ্ক্ষী
 উড়ে যাচ্ছে যা — উড়ডীয়মান

উপকারীর উপকার স্বীকার করে না যে

—অকৃতজ্ঞ

উপকারীর উপকার স্বীকার করে যে— কৃতজ্ঞ
 উর্বর নয় যা — অনুর্বর।
 উপকারের বিনিময়ে উপকার — প্রত্যুপকার।

ঊ

ঊর্ধ্ব ও বক্রভাবে যা গমন করে — তরঙ্গ।
 উর্ণা নাভিতে যার — উর্ণনাভ।
 ঊর্ধ্ব থেকে নিম্নে গমন — অবতরণ।
 ঊর্ধ্ব দিকে গমন করে যে — ঊর্ধ্বগামী।
 ঊর্ধ্ব দিকে গতি যার — ঊর্ধ্বগতি।
 ঊর্ধ্ব মুখে সাঁতার — চিংসাঁতার

ঋ

ঋণ আছে যার — ঋণী।
 ঋণ নেই যার — অঋণী।
 ঋষির দ্বারা উক্ত — আর্য।
 ঋণ দান করে যে উত্তমর্ণ — ঋণদাতা।
 ঋণ গ্রহণ করে যে অধমর্ণ — ঋণগ্রহীতা।
 ঋণগ্রস্ত অবস্থা — ঋণিতা।
 ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন যিনি — ঋত্বিক।
 ঋণ শোধে অসমর্থ — দেউলিয়া।

এ, ঐ

একই মাতার উদরে জাত যে — সহোদর
 এক থেকে আরম্ভ করে ক্রমাগত — একাদিক্রমে
 একসঙ্গে পাঠ করে যে — সহপাঠী।
 এক বিষয়ে যার চিন্তা নিবিষ্ট — একাগ্রচিন্তা।
 এক মতের ভাব — ঐকমত্য।
 ঐক্যের অভাব — অনৈক্য।
 ঐশ্বর্যের অধিকারী — ঐশ্বর্যবান।
 একের পরিবর্তে অনেক — বিকল্প।
 এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ায় যে
 — যাযাবর।
 একবার শুনলে যার মনে থাকে — শ্রুতিধর।

ও, ঔ

ওজন পরিমাপের যন্ত্র — তুলাদণ্ড
 ওষুধ পাওয়া যায় যেখানে — ঔষধালয়
 ঔষধি থেকে উৎপন্ন — ওষু
 ঔষধের আনুষঙ্গিক সেব্য — অনুপান

ক

ক্রমশ উঁচু যে পথ — চড়াই।
 ক্রমশ নিচু যে পথ — উৎরাই/উতরাই।
 কূলের সমীপে — উপকূল।

কষ্টে যা বরণ করা যায় — দুর্বার।
 কষ্ট সহ্য করতে পারে যে — কষ্টসহিষ্ণু।
 কাতর নয় এমনভাবে — অকাতরে
 কষ্টে লাভ করা যায় যা — দুর্লভ।
 কষ্টে অতিক্রম করা যায় যা- দুরতিক্রম্য।
 কোনো কিছুতে ভয় নেই যার — অকুতোভয়।
 কর্ম সম্পাদনে পরিশ্রমী — কর্মঠ।
 কীর্তির খ্যাতি আছে যার — কীর্তিমান।
 ক্রমাগত বর্ধমান — ক্রমবর্ধমান।

খ

খ্যাতি আছে যার — খ্যাতিমান।
 খাবার ইচ্ছা — ক্ষুধা।
 খরচের হিসাব নেই যার — বেহিসাবি।
 ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত — ক্ষুধার্ত।
 ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এমন — ক্ষীয়মান।
 ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী — ক্ষণস্থায়ী।

গ

গৃহে থাকে যে গৃহস্থ — সামান
 গৃহে পালিত হয় যা গৃহপালিত।
 গৃহ নেই যার — অনিকেত
 গরুর চোখের মতো ছোট বায়ু পথ — গবাক্ষ।
 গোপনে সংবাদ বহন করে যে — গুপ্তচর।

গৃহে স্থায়ীভাবে বাসকারী দুষ্ট ব্যক্তি

— বাস্তুঘুঘু

গাছে উঠতে পটু যে — গেছো।

গ্রহণ না করা — প্রত্যাখ্যান।

ঘ

ঘুমিয়ে (প্রচ্ছন্ন) আছে যে — সুপ্ত।

ঘটকের কাজ — ঘটকালি।

রে পালিত যে জামাই — ঘরজামাই।

ঘোলের মতো ভাব — ঘোলাটে।

ঘৃণার যোগ্য — ঘৃণ্য।

ঘামে ভেজা — ঘর্মাক্ত।

ঘন হয়ে বা জমে উঠছে এমন — ঘনায়মান।

চ

চার খন্ডে চেরা — চৌচির।

চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত — চাক্ষুষ।

চৈত্র মাসে উৎপন্ন — চৈতালি।

চিরকাল মনে রাখার যোগ্য — চিরস্মরণীয়।

চিরকাল ধরে স্থায়ী — চিরস্থায়ী।

চক্ষু লজ্জা নেই যার — বেহায়া/নির্লজ্জ।

চিন্তার অতীত যা — চিন্তাতীত।

চঞ্চল করে যা — চাঞ্চল্যকর।

চার রাস্তার মিলন — চৌরাস্তা।

চিন্তা করা যায় না যা — অচিন্ত্যনীয়।

চোখে দেখা যায় এমন — প্রত্যক্ষ।

ছ

ছবি আঁকে যে — চিত্রকর।

ছল করে যে কান্না — মায়াকান্না।

ছুড়ে ফেলা হয়েছে — নিষ্কিণ্ড।

ছড়ানো হয়েছে এমন — বিকীর্ণ।

ছলনা করে যে — ছলনাময়ী।

ছেঁকে নেয়ার উপকরণ — ছাঁকনি।

ছায়াপ্রধান যে তরু — ছায়াতরু।

ছেঁড়া হয়েছে এমন — ছিন্ন।

জ

জাতি থেকে ভ্রষ্ট — জাতিভ্রষ্ট।

জানবার ইচ্ছা — জিজ্ঞাসা।

জয় করার ইচ্ছা — জিগীষা।

জুয়া খেলে যে — জুয়াড়ি।

জন্ম থেকে অন্ধ — জন্মান্ধ।

জানু পর্যন্ত — আজানু।

জলে ও স্থলে চরে — উভয়চর।

ঝ

ঝড় বা বাতাসের ধাক্কা — ঝাপটা।
 ঝন ঝন শব্দ — ঝনাৎকার।
 ঝুলে পড়েছে এমন — ঝলস্বিত।
 ঝট করে টান — ঝটকা।
 ঝাড়মোছ হয় যার দ্বারা — ঝাড়ন।
 ঝগড়া করা স্বভাব যার — ঝগড়াটে।

ট

টোলে সংস্কৃত পড়ানো যে পন্ডিতের কাজ
 ‘ — টুলোপন্ডিত।
 টোকানোর কাজ করে যে — টোকাই।
 টোল পড়েনি এমন — নিটোল।

ঠ

ঠাকুরের ভাব — ঠাকুরালি।
 ঠেঙিয়ে যারা দস্যুতা করে — ঠ্যাঙাড়ে।

ড

ডুব দিতে পটু যে — ডুবুরি।
 ডানার অভ্যন্তর — পক্ষপুট।
 ডিঙ্গি বাইবার দাঁড় — বৈঠা।
 ডালের আগা — মগডাল।
 ডুবে যাচ্ছে এমন — ডুবন্ত।

ঢ

ঢাকের প্রবল আওয়াজ — ঢক্কাণিনাদ।
 ঢাকায় উৎপন্ন — ঢাকাই।

ত

তপস্যা ই যার ধন — তপোধন।
 তীরের দ্বারা বিদ্ধ — তীরবিদ্ধ।
 তীর চালনায় যে পটু — তীরন্দাজ।
 তটে থাকে যে — তটস্থ।
 তিন স্রোত বিশিষ্ট নদী — ত্রিধারা/ত্রিস্রোতা।
 তোপের ধ্বনি — গুডুম।
 তিন কালের ঘটনা যিনি দেখতে পান —
 ত্রিকালদর্শী।
 তরঙ্গ আছে যার — তরঙ্গিনী।
 তণু থেকে জাত — তনুজ।
 তিনবার অঞ্জলি দিয়ে অর্পণ — ত্রিনাঞ্জলি।
 তল স্পর্শ করা যায় না যার — অতলস্পর্শী।
 তেজ আছে যার — তেজস্বী।
 তালুর সাহায্যে উচ্চারিত — তালব্য।

থ

থেমে থেমে চলার যে ভঙ্গি — ঠমক

দ

দ্বারে থাকে যে — দ্বারস্থ।
 দূরকে দেখার শক্তি — দূরদৃষ্টি।
 দেখার যোগ্য — দর্শনীয়/দ্রষ্টব্য।
 দূরকে যিনি দেখতে পান না — অদূরদর্শী।
 দূরকে দেখার শক্তি আছে যার — দূরদর্শী।
 দুয়ের মধ্যে একটি — অন্যতম।
 দর্শন শাস্ত্রে যিনি পণ্ডিত — দার্শনিক।
 দু'রকম অর্থ যার — দ্ব্যর্থক।
 দান করার ইচ্ছা — দিৎসা।
 দয়া নেই যার — নির্দয়।
 দন্ড দেবার যোগ্য — দন্ডাই/দন্ডনীয়।

ধ

ধ্যান করার যোগ্য — ধ্যেয়।
 ধুলায় পরিণত — ধূলিসাৎ।
 ধন জয় করেন যিনি — ধনঞ্জয়।
 ধ্যান করেন যিনি — ধ্যানী।
 ধ্যানে যিনি মগ্ন — ধ্যানস্থ।
 ধনুকের শব্দ — টঙ্কার।
 ধারণ বা পোষণ করে যা — ধর্ম।
 ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান — ধর্মিষ্ঠ।

ন

নাটকের রচয়িতা — নাট্যকার।
 নাটকের অভিনয় যেখানে হয় — নাট্যশালা।
 নেই অপরাধ যার — নিরপরাধ।
 নেই অভিমান যার — নিরভিমান।
 নগরের শান্তি রক্ষা করেন যিনি — নগরপাল।
 নিন্দার যোগ্য নয় যা — অনিন্দ্য।
 নিজেকে সামলাতে পারে না যে — অসংযমী।
 নিজেকে হত্যা করে যে — আত্মঘাতী।
 নিন্দা করার ইচ্ছা — জুগুন্সা।
 নষ্ট হয় না যা — অবিনশ্বর।

প

পা থেকে মাথা পর্যন্ত — আপাদমস্তক।
 পান করার ইচ্ছা — পিপাসা।
 পানের যোগ্য — পেয়।
 পূর্বজন্মের কথা যে স্মরণ করতে পারে
 — জাতিস্মর।
 পরিণামে কি হবে দেখার ক্ষমতা নেই যার
 — অপরিণামদর্শী।
 পণ্ডিত হয়েও যিনি মূর্খ — পণ্ডিতমূর্খ।
 পরিমিত কথা বলে যে — মিতভাষী।

পুনঃপুন যে রোদন করছে — রোরুদ্যমান।

পাঁচ মিশালি মসলা — পাঁচফোড়ন।

পাওয়ার ইচ্ছা — ঈঙ্গা।

ফ

ফল পাকলে যে গাছ মরে যায় — ওষধি

ফেলে দেবার যোগ্য — ফেলনা।

ফুল হতে জাত — ফুলেল।

ফুলের গন্ধে সুবাসিত — ফুলের।

ফল দ্বারা আহার — ফলাহার/ফলার।

ফুলের বাইরের আবরণ — বৃতি।

ফল প্রসব করে যা — ফলপ্রসূ।

ফুলের মতো অগ্নিকণা — সস্কুলিঙ্গ।

ফুরায় না যা — অফুরন্ত।

ফল বা সন্তান উৎপাদনে অক্ষম — বাঁজা/বক্ষ্য

ব

বলার যোগ্য নয় — অকথ্য।

বেতনে কাজ করে যে — অবৈতনিক।

বৃহৎ বৃক্ষ — বনস্পতি।

বয়সে সকলের বড় — বয়োজ্যেষ্ঠ।

বয়সে সকলের ছোট — কনিষ্ঠ

বয়ে চলেছে যা — বহতা/বহমান।

ব্যয় যে অধিক করে — অমিতব্যয়ী।

বিশ্বাস করা যায় না — অবিশ্বাস্য।

বেদান্ত জানেন যিনি — বৈদান্তিক।

বলার ইচ্ছা — বিবক্ষা।

বিশেষরূপে খ্যাতি আছে যার — বিখ্যাত।

বোধ নেই যার — নিবোধ।

বেশি কথা বলে যে — বাচাল।

ভ

ভবিষ্যতে যা ঘটবে — ভবিতব্য।

ভোজনের ইচ্ছা — বুভুক্ষা।

ভবিষ্যতে কি হবে দেখে না যে

— অপরিণামদর্শী।

ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাজ করে যে — দূরদর্শী

ভূমিতে চরে যে ভূচর।

ভ্রাতার পুত্র- ভ্রাতৃব্য।

ভোজনের যোগ্য- ভোক্তব্য।

ভঙ্গ হয় যা ভঙ্গুর।

ভবিষ্যতে অবশ্যই হবে- অবশ্যস্ভাবী।

বাস্তু হারিয়েছে যে বাস্তুহারা।

ম

মৃতের মতো অবস্থা যার — মুমূর্ষু।

মাথা পেতে নেবার যোগ্য — শিরোধার্য।

মমতা নেই যার — নির্মম।

মায়া (ছলনা) জানে না যে — অমায়িক।

মৃত্যু পর্যন্ত — আমৃত্যু।
মুগ্ধ করে যে নারী — মোহিনী।
মাসের শেষ দিন — সংক্রান্তি।
মনে মনে করা অঙ্ক — মানসাক্ষ।
মুক্তি পেতে ইচ্ছুক — মুমুক্শু।
মাছ বিক্রি করে যে — মেছো।

য

যার জিভ লক লক করে — লেলিহান।
যা লঙ্ঘন করা যায় না — অলঙ্ঘ্য।
যা পরিহার করা যায় না — অপরিহার্য।
যা নিবারণ করা যায় না — অনিবার্য।
যা সহজে লাভ করা যায় — সুলভ।
যা সহজে জানা যায় না — দুর্জয়ে।
যে শোনামাত্র মনে রাখতে পারে — শ্রুতিধর।
যা পূর্বে ঘটেনি — অভূতপূর্ব।
যা পূর্বে হয়নি — অপূর্ব।
যা অস্বীকার করা যায় না — অনস্বীকার্য।
যে গাছের ফুল হয় না, ফল হয় — বনস্পতি।
যে কিছুই পরোয়া করে না — বেপরোয়া।

র

রাজপথে যে ডাকাতি করে — রাহাজানি।
রক্ত মাখা বস্ত্র — রক্তাংগুক।
রস নেই যার — নীরস।

রস আছে যাতে — রসাল।
রেশম দিয়ে নির্মিত — রেশমি।
রং করে যে — রঞ্জক।

ল

লুট করে যারা — লুটেরা।
লোক গণনা — আদমশুমারি।
লাভ করার ইচ্ছা — লিপ্স।
লক্ষ করার যোগ্য — লক্ষণীয়।
লোলুপ দৃষ্টি যার — লোভী।
লাজ আছে যার — লাজুক।
লজ্জা পাচ্ছে যে — লজ্জমান।

শ

শখ আছে যার — শৌখিন।
শুকনা পাতার ধ্বনি — মর্মর।
শুনবার ইচ্ছা — শুশ্রূষা।
শত্রুকে বধ করে যে — শত্রুঘ্ন।
শত্রুকে দমন করে যে — অরিন্দম।
শোনামাত্র যার মুখস্থ হয় — শ্রুতিধর।।
শৃঙ্খলা মানে না যে — উচ্ছৃঙ্খল।
শাসন করা যায় যাকে — শিষ্য।
শিক্ষা করছে যে — শিক্ষানবিশ।
শাসন করে যে — শাসক

ষ

ষাট বছর পূর্ণ উপলক্ষে আনন্দ উৎসব
— হীরকজয়ন্তী।

ষোল বছর বয়স্কা — ষোড়শী।

স

সকলের জন্য প্রযোজ্য — সর্বজনীন
সহ্য করা যার স্বভাব — সহিষ্ণু।
স্ত্রীলোকের কেশবিন্যাস — কবরী।
সাক্ষাৎ যে দেখে — প্রত্যক্ষদর্শী।
সেবা করার ইচ্ছা — শুশ্রূষা।
সৎ কুলে জাত — কুলীন।
স্পৃহার অভাব — অনীহা।
সকল পদার্থ ভক্ষণ করে যে — সর্বভুক।
সাগরে বিচরণ করে যে নারী — সাগরিকা।
সরোবরে জন্মে যে — সরোজ

হ

হনন করার ইচ্ছা — জিঘাংসা
হস্তীর থাকার স্থান — পিলখানা।
হাস্যরসাত্মক নাটক — প্রহসন।
হাতের লেখা বইয়ের খসড়া — পাণ্ডুলিপি।
হরণ করার ইচ্ছা — জিহীর্ষা।
হাতেকলমে যে শিক্ষা — প্রশিক্ষণ।

ক্ষ

ক্ষুধা দ্বারা পীড়িত — ক্ষুণ্ণপীড়িত।
ক্ষণকালের জন্য স্থায়ী — ক্ষণস্থায়ী।
ক্ষমার যোগ্য — ক্ষমাহ।
ক্ষমা করার যোগ্য — তিতিক্ষা।
ক্ষমা করতে ইচ্ছুক — তিতিক্ষু।

❖ ধ্বনি বা শব্দ সম্বন্ধীয়:

বীরের ধ্বনি — হুঙ্কার।
কোকিলের ডাক — কুহ।
ময়ূরের ডাক — কেকা।
সমুদ্রের শব্দ — গর্জন।
পুরুষের নৃত্য — তাণ্ডব।
পাতার শব্দ — মর্মর।
নদীর শব্দ — কল্লোল।
হেমন্তকালে জন্মে যে — হৈমন্তিক।
নূপুরের শব্দ — নিক্কণ।
ঘোড়ার ডাক — হেঁষা।
অলঙ্কারের শব্দ — শিঞ্জন।
মেঘের শব্দ — গর্জন।
ময়ূরের ডাক — কেকা।
পাখির ডাক — কৃজন।
বিহঙ্গের ধ্বনি — কাকলি।

প্রবাদ প্রবচন

প্রবাদ শব্দের অর্থ জনশ্রুতি বা পরম্পরাগত বাক্য। আর প্রবচন শব্দের অর্থ হলো বহুল প্রচলিত উক্তি অর্থাৎ, প্রবাদ ও প্রবচন বলতে পরম্পরাগত বহুল প্রচলিত উক্তিকে বোঝায়। এটি একক কোনো ব্যক্তির রচনা বা সৃষ্টি নয়। এটি প্রাচীনকাল থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে। লোকসাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট শাখা প্রবাদ ও প্রবচন মানুষের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার একটি সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে সৃষ্ট প্রবাদ ও প্রবচনের মূল লক্ষ্য নীতি ও উপদেশ বিতরণ। এগুলো সৃষ্টির পেছনে রয়েছে একটি অর্থপূর্ণ ইতিহাস। প্রত্যেকটি প্রবাদ-প্রবচনের পেছনে রয়েছে একটি করে উপদেশমূলক গল্প। এই প্রবাদ বা প্রবচনগুলোর উৎপত্তি কোন সময়ে, কোথায় তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। তবে যুগ যুগ ধরে লোকের মুখে মুখে এ প্রবাদগুলো চলে আসছে। এগুলো বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদ।

প্রবাদ-প্রবচনের কতিপয় নমুনা:

অ

অসারের তর্জন গর্জন সার (গুণহীনের বৃথা/ব্যর্থ আশ্বালন): কোনো দায়িত্বই ঠিকমতো পালন করতে পার না, কেবল বড় বড় কথা-অসারের তর্জন গর্জন সার।

অভাবে স্বভাব নষ্ট (অভাবে পড়লে ভালো মানুষও অসৎ হয়): আলম সাহেবের মতো একজন প্রতিবাদী মানুষ সংসারের যাঁতাকলে পড়ে মোসাহেব সেজেছেন। একেই বলে অভাবে স্বভাব নষ্ট।

অতি চালাকের গলায় দড়ি (বেশি চালাকি করে অপরকে ঠকালে, নিজেও বিপদগ্রস্ত হতে হয়) বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ করতে গিয়ে ধরা পড়ে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হলো- একেই বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী (সামান্য লেখাপড়ার ক্ষতিকর প্রভাব) দুই কলম লেখাপড়া শিখে সে বড় বড় বুলি ঝাড়ে, একেই বলে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।

অতি দর্পে হত লংকা (অহংকার করলে পতন আসবেই) শহরে গিয়ে বড়লোক হয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষকে ভুলে যেও না, মনে রেখো, অতি দর্পে হত লংকা।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ (কপট ব্যক্তির বাহ্যিকভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে): ভালো ছেলে ভেবে একটা লম্পটের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দিবে? ভুলে যেও না, অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট (বেশি লোক হলে কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়) দু'জনে যা পারেন তাই করেন, জানেন তো অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

অদৃষ্টের ফল, খন্ডাবে কে বল? (ভাগ্যে যা থাকে তার আর পরিবর্তন হয় না)- এত সম্পত্তি, ছেলেমেয়ে নিয়ে এত সুখের সংসার। এক জলোচ্ছ্বাসে সব শেষ। অদৃষ্টের ফল, খন্ডাবে কে বল?

অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায় (ভাগ্য যার খারাপ, কোনো দিকেই সে আশা দেখতে পায় না) সেলিম ভাইয়ের চাকরি হলো না, ব্যবসা করতে গিয়ে টাকা গেল, শেষে মাছের চাষ করে যাও বা একটু সম্ভাবনা ছিল বন্যায় সব শেষ। আসলে অভাগা যে দিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়।

আ

আঙুর ফল টক (পান না তাই খান না): কাজটা পেলে না তাই বলছ কাজটা ভালো না- আঙুর ফল টক।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম (নিজের স্বার্থ রক্ষা করা): নিজের থাকার জায়গা হচ্ছে না, আবার বলছ আমার খালাতো ভাই থাকবে-জান না, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

আগে দর্শনদারি পরে গুণবিচারি (বাহ্যিক সৌন্দর্য দ্বারাই মানুষ প্রথম আকৃষ্ট হয়) যাকে দেখেই পছন্দ হয় না, তার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আসবে কী করে? আগে দর্শনদারি পরে গুণবিচারি।

আপনি ভালো তো জগৎ ভালো (নিজে ভালো হলে সবাই ভালো হয়) শুধু অন্যের দোষ খোঁজ না, আগে নিজে ভালো হও- আপনি ভালোতো জগৎ ভালো।

আঙুল ফুলে কলাগাছ (অবিশ্বাস্য উন্নতি) রাজনীতি করে অনেক নেতাই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে।

আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর নেয়া (অনধিকার চর্চা করা) তুমি ছোট মানুষ, ছোট মানুষের মতো থাক- আদার ব্যাপারি হয়ে জাহাজের খবর নিতে যেও না।

আপন পায়ে কুড়াল মারা (নিজের ক্ষতি নিজে করা): অনেক মেধাবী ছাত্রই শখের বসে রাজনীতিতে নাম লিখিয়ে আপন পায়ে কুড়াল মারে।

ই

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয় (অপরের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়) আজ যদি তাকে তুমি একটি চড় মার কাল সে তোমাকে দুটি চড় মারবে, জানো তো ইট মারলে পাটকেল খেতে হয়।

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় (কাজে ব্রতী হলে একটা না একটা উপায় বের হবেই) লন্ডন যেতে চাও; এখন থেকেই প্রস্তুতি নাও; ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়।

উলুবনে মুক্তা ছড়ানো (অযোগ্য পাত্রে মূল্যবান বস্তু দান): একটা চোরকে নীতি কথা শোনানো আর উলুবনে মুক্তা ছড়ানো একই কথা।

উনো ভাতে দুনো বল (অল্প আহারে শক্তি বৃদ্ধি) বেশি ভাত খেলে বেশি বল হয় এমন কোনো কথা নেই, বরং উনো ভাতে দুনো বল।

উচিত কথায় বন্ধু বেজার (সত্য কথা বললে আপনজনও রুষ্ট হয়) উচিত কথা বলেছি তো তাই এত খারাপ লাগছে। কথায় আছে না উচিত কথায় বন্ধু বেজার।

উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায় (কাজের শুরু দেখেই পরিণাম বোঝা যায়) এ ছেলে একদিন অনেক বড় শিল্পী হবে- উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়।

এ

এক টিলে দুই পাখি মারা (একই সঙ্গে দুই উদ্দেশ্য সাধন করা) অফিসিয়াল কাজে ঢাকা গিয়ে কাজও করব, আর ভালো ভালো জায়গাও দেখব। এক টিলে দুই পাখি মারব আর কি।

এক মাঘে শীত যায় না (একবারেই বিপদ শেষ হয় না): প্রয়োজন ফুরিয়েছে তাই খোঁজ রাখ না; কিন্তু মনে রেখ এক মাঘে শীত যায় না।

এক হাতে তালি বাজে না (দুই পক্ষ না হলে ঝগড়া হয় না) যতই বল না কেন তোমার কোনো দোষ নেই, তোমারও দোষ আছে। কারণ এক হাতে তালি বাজে না।

এক বাঁকের কই (একই দল বা মতের অনুসারী) ওরা সবই এক বাঁকের কই তো, তাই চলাফেরা, কথাবার্তা সবই এক রকম।

এক গোয়ালের গরু (একই দল বা মতের লোক): তোমার কথা তো রহিম সমর্থন করবেই, কারণ তোমরা যে এক গোয়ালের গরু।

ক

কয়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মরলে (খারাপ লোক সহজে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে পারে না): কালু শিক্ষিত হলেও এখনও ভদ্র হতে পারেনি। কথায় আছে না, কয়লা যায় না ধুলে, স্বভাব যায় না মরলে।

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা (এক যন্ত্রণার ওপর আর এক নিদারুণ যন্ত্রণা) ও একবার শিক্ষকের বকা খেয়েছে তার ওপর তোমরা মস্করা করছ। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিতে কি তোমাদের খুব ভালো লাগে?

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা (শত্রুর দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করা): পশ্চিমা দেশগুলো দেশে দেশে দ্বন্দ্ব লাগিয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায়।

কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ (একজনের যখন আনন্দ, অন্যজনের তখন বিপদ) পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে কেউ হাসে কেউ কাঁদে- একেই বলে কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ।

কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলে না (সাধনা না করলে জীবনে সাফল্য আসে না) জীবনে বড় হতে চাইলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কথায় আছে কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে না।

কাজের বেলায় কাজী, কাজ ফুরালে পাজী (প্রয়োজনে কাউকে কাছে ডাকা, অপ্রয়োজনে মুখ ফিরিয়ে রাখা): নির্বাচনের সময় বড় বড় নেতারা গরিবের বাড়িতে হাজির হয়, কিন্তু নির্বাচন শেষ হলে আর খুঁজে পাওয়া যায় না- এই জন্যই বলে কাজের বেলায় কাজী কাজ ফুরালে পাজী।

খ

খিদে পেলে বাঘেও ধান খায় (প্রয়োজনের অধিক): বিএ পাস ছেলেটি চাকরি না পেয়ে। রিকশা চালাচ্ছে- একেই বলে খিদে পেলে বাঘেও ধান খায়।

খাল কেটে কুমির আনা (নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা): দুষ্ট লোককে ঘরে ঠাঁই দেয়া আর খাল কেটে কুমির আনা একই কথা।

খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি (আয়ের চেয়ে ব্যয় বা আড়ম্বর বেশি) পরীক্ষায় পাস করেছে তাই বলে বাড়িতে শত শত লোকের দাওয়াত; এ যে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি।

গ

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল (প্রাপ্তির আগেই ভোগের আয়োজন): চাকরি না পেয়েই গাড়ি-বাড়ি করার স্বপ্ন দেখছ, এ যে দেখছি গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

গরু মেরে জুতা দান (গুরুতর অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সামান্য অর্থ ব্যয়): আমার এতবড় সর্বনাশ করে আবার এসেছ করুণা দেখাতে- গরু মেরে জুতা দান।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি (কাজ শুরু করার আগেই ফল প্রাপ্তি) চাকরিতে যোগ দিতে না দিতেই এক মাসের অগ্রিম বেতন- এ তো দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

ঘ

ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি (চতুর ব্যক্তিকে কৌশলে জব্দ করার ইঙ্গিত) আমার সঙ্গে অত চালাকি করলে ফলাফল ভালো হবে না। কারণ ঘুঘু দেখেছ, ঘুঘুর ফাঁদ দেখনি।

চ

চকচক করলেই সোনা হয় না (বাইরের চাকচিক্যে আসল পরিচয় ফুটে ওঠে না): সুন্দর আচার ব্যবহার দেখে মনে হয় লোকটি ভালো। কিন্তু সত্যি বলতে কী, চকচক করলেই সোনা হয় না।

চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনি (অসৎ লোককে উপদেশ দেয়া বৃথা): যারা শিখতে চায় না শুধু সার্টিফিকেট চায়, নকল তারা করবেই। যতই নিষেধ করো শুনবে না। কথায় আছে না চোরে না শুনে ধর্মের মর কাহিনি।

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে (সুযোগ হাতছাড়া হলে মাথায় নানা ফন্দিফিকির আসে): যখন করা দরকার ছিল তখন করনি; আর এখন বড় বড় কথা বলছ- কথায় আছে না চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।

ছ

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা (অসম্ভব কল্পনা করা) একটা রিকশাওয়ালার ছেলে হয়ে বড় লোকের সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখছ- এ যে দেখছি ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা।

জ

জোর যার মুল্লুক তার (শক্তিশালীরাই টিকে থাকে) গণতন্ত্রের যুগে এখন ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতিই প্রতিষ্ঠিত।

ঝ

ঝোপ বুঝে কোপ মারা (সুযোগের সদ্ব্যবহার করা): মন্ত্রী সাহেবের খোশমেজাজ থাকতে থাকতে তিনি কাজটি সেরে নিলেন। একেই বলে ঝোপ বুঝে কোপ মারা।

ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি ঝড়ে ঝড়ে (অন্যের দ্বারা সম্পাদিত কাজের কৃতিত্ব নিয়ে নিজের বলে জাহির করা) ভন্ডাবাবা দাবি করছে তার কুদরতেই নাকি রহীমা বিবির পুত্র সন্তা সন্তান হয়েছে; একেই বলে ঝড়ে বক মরে ফকিরের রের কেরামতি ঝড়ে।

ড

ডুবে ডুবে জল খাওয়া (গোপনে গোপনে কোনো কাজ করা) তুমি যে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ, সে খবর জানতে কারো বাকি নেই।

ঢ

ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার (ক্ষমতা না থাকলে কর্তৃত্ব করতে। যাওয়া বৃথা): স্কুলে এসেছে অথচ বই-খাতা-কলম কিছুই নেই। এ তো দেখছি ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে (অবস্থার উন্নতি হলেও কাজ বা স্বভাবের পরিবর্তন না হওয়া): কুয়াকাটায় বেড়াতে গিয়েও ডাক্তার সাহেব রোগী দেখলেন; এজন্যই বলে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ত

তিল কুড়িয়ে তাল (তুচ্ছ কিছু জমিয়ে জমিয়ে বড় কিছুর সৃষ্টি): রহিম তার ছেলেটিকে ডাক্তারি পাস করাবে বলে দু-চার পয়সা করে জমাচ্ছে। জানি না তার তিল কুড়িয়ে তাল করার আশা পূর্ণ হবে কিনা।

তেলা মাথায় তেল দেয়া (যার অনেক আছে তাকে আরও দেয়ার প্রবৃত্তি) তেলা মাথায় তেল দেয়া এখন জাতির স্বভাবে পরিণত হয়েছে।

দ

দশের লাঠি একের বোঝা (মিলিত প্রচেষ্টায় কঠিন কাজও সহজ হয়) সবাই মিলেমিশে কাজ করলে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। এজন্য বলে দশের লাঠি একের বোঝা।

দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পোষা (শত্রুকে সযত্নে প্রতিপালন): ছেলেটাকে ভালো মনে করে বাড়িতে ঠাই দিলাম, আর ও আমার এত বড় সর্বনাশ করল। আগে জানলে কি দুধ কলা দিয়ে কাল সাপ পুসতাম না।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না (যা আছে তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারা): বাবা বেঁচে থাকতে তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করেছি। বাবা মারা যাবার পর বুঝতে তে পারছি, আসলেই আমি দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝিনি।

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো (বিঘ্ন সৃষ্টিকারী লোক কাজের হলেও তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া মঙ্গলজনক) বাড়ির চাকরটাকে। বিদায় করে দাও। কারণ দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

ধ

ধরি মাছ না ছুঁই পানি (কিছুমাত্র বেগ না পেতে হয় এমন কৌশল সিদ্ধি) মাছ ধরবেন কিন্তু কাপড় ভিজাবেন না, আপনার এই ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ নীতি আমার ভালো লাগে না

ধান ভানতে শিবের গীত (এক প্রসঙ্গ শুরু করে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা) যা বলতে এসেছ তা সংক্ষেপে খুলে বল, ধান ভানতে শিবের গীত কর না।

ন

নিজের ঢাক নিজে পেটানো (নিজেই নিজের গুণগান করা)- আমি কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই ভদ্রলোক বলতে লাগলেন তিনি কলকাতা থেকে পিএইচ ডি করেছেন, অমুক সচিব তার চাচাশ্বশুর, অমুক নেতা তার মামাশ্বশুর, অমুক পুলিশ অফিসারের সঙ্গে তার খায়খাতির। আমি তো অবাক। বুঝলাম নিজের ঢাক নিজে পেটানো লোকটার অভ্যাস।

নিজের চরকায় তেল দেওয়া (নিজের কাজে মনোযোগী হওয়া)- আমাকে অত জ্ঞান দিচ্ছ কেন? আমারটুকু আমি যেভাবেই পারি করব। তুমি তোমার নিজের চরকায় তেল দাও।

নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা (নিজেই নিজের অনিষ্ট করা)- অন্যকে দোষ দিয়ে কী হবে; আমিই তো নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। না হলে এমন সুন্দর বাড়ি কেউ বিক্রি করে দেয়?

নুন আনতে পানতা ফুরোয় (অভাবে অভাবে ৪৬ শ্রমাবল বিপর্যন্ত অবস্থা)- বাবা যা বেতন পান তাতে বাড়ি ভাড়া দেবার পর নুন আনতে পান্তা ফুরোয় অবস্থা।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো (না থাকার চেয়ে কিছু থাকা ভালো) যা পাই তাই নিয়ে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কেননা নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা (অক্ষমতা ঢাকার জন্য বাজে অজুহাত) যতবার রোজিনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে গান গাইতে বলি ততবারই তিনি বলেন এখানে নাকি তার গানের সুর করার মতো ভালো সুরকার নেই। আসলে নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।

প

পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা (অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজের স্বার্থ হাসিল করা): পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে ভেঙেই মোবারক মিয়া গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছে।

পরের ধনে পোদারি (অপরের অর্থ যথেষ্ট ব্যয় করা): নিজের আয় করা অর্থ ব্যয় করতে হলে বুঝতে টাকা-পয়সার দরদ, পরের ধনে পোদারি কর বলে টাকা-পয়সার কোনো মায়া নেই।

পেটে খেলে পিঠে সয় (লাভের সম্ভাবনা থাকলে কষ্ট সহ্য করা যায়) মাস শেষে তার দেয়া টাকায় আমার সংসার চলে। দু'চার কথা তিনিতো বলতেই পারেন। জান তো পেটে খেলে পিঠে সয়।

ব

বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খায় (অসম্ভব সম্ভব হয়); মন্ত্রী দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে পানি খায়।

বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা (শত্রু বা প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়লে নাজেহাল হতেই হয়) ওরা পুলিশকে ক্ষেপিয়েছে। এখন বুঝবে মজা। জানে না বোধ হয় বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

বানরের গলায় মুক্তোর মালা (অযোগ্যের সুন্দর বস্তু লাভ)। ঐ কদাকার বদমাশটার এমন সুন্দরী শিক্ষিত বৌ-এ যে বানরের গলায় মুক্তোর মালা।

বিনা মেঘে বজ্রপাত (আকস্মিক বিপদের উদয়) বিশ বছর চাকরির পর অসুস্থতার অজুহাতে সিরাজ রাজ সাহেব যখন চাকরি থেকে বরখাস্তের নোটিস পেলেন তখন তা তার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো মনে হলো।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না (টাকা থাকলে লোকজনের অভাব অভাব হয় না): এই অলস কাজের লোক আমাদের দরকার নাই। কথায় আছে না ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

ভূতের মুখে রাম নাম (অসম্ভব ব্যাপার) হান্নান নিজে একজন সন্তাসী, সে আবার সন্তাস দমনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে, এ যে দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম।

ম

মশা মারতে কামান দাগা (সামান্য ব্যাপারে বিরাট আয়োজন) ছেলে না হয় গাছের দুটো আম খেয়েছে, তার জন্য থানা পুলিশ? এজন্যই তো বলে মশা মারতে কামান দাগা।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত (ক্ষমতার বাইরে কেউ কিছু করতে পারে না) তার যত স্টাইল এখানে, বাইরে তাকে কে চেনে? কথায় আছে না মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

য

যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয় (সমস্যা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ঘুরে ফিরে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে)। এক পাওনাদারের ভয়ে বাড়ি ছাড়লাম এখানে দেখছি আরেক পাওনাদার সামনে দাঁড়িয়ে; এজন্যই বলে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে রাত হয়।

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ (শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা রাখা) খুনের দায়ে ফাঁসির দন্ড মাথায় নিয়েও বাঁচার আশা ওই দাগি আসামিটার। যদি রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেন। আসলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

যা রটে তা বটে (রটনা একেবারে অমূলক হয় না) প্রমাণিত হয়েছে যে যা রটে তা বটে।

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল (সেয়ানে সেয়ানে মুখোমুখি): আলী যেমন শক্তিশালী, আজিজ তেমনি প্রভাবশালী এবার সমানে সমানে লেগেছে- যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

যত গর্জে তত বর্ষে না (কথা অনুযায়ী কাজ কর্ম হওয়া): তোমার গলাবাজি রাখ অনেক শুনেছি, যত গর্জে তত বর্ষে না।

ল

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু (অতি লোভের পরিণাম খুব ভয়াবহ) এমন সোনাফলা জমি বিক্রি করে নামলেন দু নাম্বারি ব্যবসায়; ধরা পড়ে গেলেন জেল-হাজতে। একেই বলে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লাভের গুড় পিঁপড়ের খায় (ন্যায্য প্রাপ্য দুর্ভাগ্যক্রমে হাতছাড়া হওয়া): চাঁদাবাজদের দাপটে ব্যবসায়ীদের ত্রাহি অবস্থা তাদের লাভের গুড় এখন পিঁপড়ের খাচ্ছে।

শ

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা (তুচ্ছ কারণ দেখিয়ে অপরাধ গোপনের চেষ্টা) তুমিই যে এই অপকর্মটা করেছ তা আর জানতে কেউ বাকি নেই। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকার চেষ্টা কর না।

স

সাবধানের মার নেই (সবসময় সতর্ক থাকলে, বিপদ এড়িয়ে চলা যায়): রাস্তায় চলার সময় ডানে-বামে গাড়িঘোড়া দেখে চলা উচিত। কারণ সাবধানের মার নেই।

সাতেও নেই পাঁচেও নেই (ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে থাকা) ভদ্রলোক একেবারে আলাদা ধরনের মানুষ। কারো সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

সাপের পাঁচ পা দেখা (অহংকারে অসম্ভবকে সম্ভব, মনে করা) রাতারাতি কালো টাকার মালিক বনে রহিম যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছেন। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী কাউকেই যেন চেনেন না।

সুখে থাকতে ভূতে কিলায় (অকারণে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া): তুমি তো ভালোই ছিলে, তা আবার এ ঘটনায় জড়তে গেলে কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, সুখে থাকতে ভূতে কিলায়।

সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না (জটিল কাজ সম্পাদনে কূটকৌশলের প্রয়োজন হয়): অনেক বলেও করিমের চুরির স্বভাব গেল না বুঝতে পারছি; ওকে পুলিশে দিতে হবে। কথায় আছে না- সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না।

হ

হক কথার মার নেই (চূড়ান্ত বিচারে সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়) মিথ্যা 49-র শ্রাব প্রকৃত সত্য ঢাকা পড়লেও আসলে হক কথার মার নেই।

হাটে হাঁড়ি ভাঙা (লোকসমক্ষে গোপন তথ্য প্রকাশ): ডাকাতি করা দ্রব্যের ভাগ না পেয়ে সে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা (বুদ্ধিদোষে সৌভাগ্যের সুযোগ, নষ্ট করা) হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে এখন দুঃখ করে কোনো লাভ নেই।

হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে (বিপদে পড়লে শক্তিশালী লোককেও গঞ্জনা সহিতে হয়) ক্ষমতা হারিয়ে সাবেক এমপির এখন খুব খারাপ অবস্থা। উনি বুঝতে পারছেন হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে।

অধ্যায়
০৭

বিরচন (ভাবসম্প্রসারণ, সারাংশ/সারমর্ম)



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ ভাবসম্প্রসারণ	
❖ সারাংশ/সারমর্ম	
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	—	—	—
২০২৩	—	—	—
২০২২	০১	০২	—



জীবনে তিনটি জিনিসের প্রয়োজন – বই, বই এবং বই।



ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ভাব-সম্প্রসারণ কী?

[বাকশির্বো: ২২]

উত্তর: অকথিত কোনো ভাবকে বিকশিত করে প্রকাশ করার নামই ভাব-সম্প্রসারণ। ভাব-সম্প্রসারণে সংক্ষিপ্ত ভাবকে সম্প্রসারিত করে লেখা হয়।

২। ভাব-সম্প্রসারণের কয়টি অংশ থাকে?

উত্তর: ভাব-সম্প্রসারণের তিনটি অংশ থাকে।

৩। সারাংশ কাকে বলে?

উত্তর: গদ্যের মূলভাবকে সারাংশ বলে।

৪। সারমর্ম কাকে বলে?

উত্তর: কবিতার মূলভাবকে সারমর্ম বলে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। ‘সারাংশ ও সারমর্ম’ এই দুটির মাঝে পার্থক্য কী?

[বাকশির্বো: ২২]

উত্তর: গদ্যের মূলভাবকে বলে সারাংশ। অপরপক্ষে কবিতার মূল ভাবকে বলে সারমর্ম।

২। ভাব-সম্প্রসারণের কয়টি অংশ ও কী কী?

[বাকশির্বো: ২২]

উত্তর: ভাব-সম্প্রসারণের অংশ ৩টি, যথা-

- (১) মূলভাব,
- (২) সম্প্রসারিত ভাব,
- (৩) মন্তব্য বা উপসংহার।

৩। ভাব-সম্প্রসারণ লেখার নিয়মগুলো লেখ।

উত্তর: ভাবসম্প্রসারণ লেখার নিয়ম নিচে বর্ণিত হলো:

- (১) অন্তর্নিহিত ভাবটি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।
- (২) ভাবটিকে সুশৃংখল ভাষায় প্রকাশ করতে হবে।
- (৩) সহজ ও প্রাঞ্চল ভাষায় বিস্তৃত বর্ণনা দিতে হবে।
- (৪) আয়তন বড় হবে।
- (৫) রূপক, উপমা ইত্যাদি থাকলে সেগুলোর সার্থকতা ফুটিয়ে তুলতে হবে।
- (৬) কোনো ভাবের পুনরাবৃত্তি থাকবে না।
- (৭) প্রয়োজনে মূল বক্তব্যের সমর্থনে দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে হবে।
- (৮) ভাব-সম্প্রসারণের তিনটি অংশকে তিনটি অনুচ্ছেদে আলোচনা করতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। ভাব – সম্প্রসারণ লেখ- "প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন থাকলেই মানুষ হয় না"

উত্তর:

প্রাণ থাকলেই প্রাণী হয়, কিন্তু মন থাকলেই মানুষ হয় না

মূলভাব: জগতে জীবন্ত বস্তুমাত্রেরই প্রাণ আছে। প্রাণ থাকলেই তাকে প্রাণী বলা হয়। কিন্তু মানুষের কেবল প্রাণ থাকলেই যথেষ্ট নয়, মানুষ হওয়ার জন্য প্রয়োজন মনুষ্যত্ব। এই মনুষ্যত্ববোধের উৎস হলো মানুষের মন, যেখানে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের বোধ জাগ্রত হয়। মানুষের মতো উন্নত প্রাণী হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না, মনকে উন্নত করে মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারলেই মানুষ নামের সার্থকতা আসে।

সম্প্রসারিত ভাব: সৃষ্টির সব প্রাণীরই জীবন আছে। খাদ্য গ্রহণ, বংশবৃদ্ধি ও জৈবিক চাহিদা পূরণ- এগুলোই প্রাণীর প্রধান কাজ। কিন্তু মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা, কারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অতিরিক্ত সত্তা-যা হলো মন। মানুষের এই মন তাকে বিবেক ও বুদ্ধির অধিকারী করেছে। এই

মনের শক্তিতেই মানুষ কেবল নিজের কথা ভাবে না, অন্যের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করে, অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখায়, ত্যাগ স্বীকার করে এবং সামাজিক বন্ধন তৈরি করে। মানুষের মধ্যেই নীতি-নৈতিকতা, প্রেম, প্রীতি, ভালোবাসা, পরোপকার ও মানবতাবোধের মতো মহৎ গুণাবলি জন্ম নেয়। এ কারণেই মানুষকে বলা হয় সৃষ্টির সেরা জীব।

কিন্তু জন্মগতভাবে দেহ নিয়ে পৃথিবীতে এলেই কেউ প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠে না। যদি মানুষের মন সংকীর্ণ, স্বার্থপর এবং অমানবিক হয়, তবে তার সঙ্গে ইতর প্রাণীর কোনো পার্থক্য থাকে না। যে ব্যক্তি কেবল নিজের উদরপূর্তিতে ব্যস্ত থাকে, যার মধ্যে দয়া-মায়া, বিবেক বা মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নেই, সে দেখতে মানুষের মতো হলেও আসলে পশুর সমান। পশুরও প্রাণ আছে, কিন্তু বিবেক নেই। তেমনি, মানবিক গুণাবলিহীন মানুষও প্রাণীর স্তরে নেমে যায়। তাই, কেবল 'মন' থাকলেই চলবে না, সেই মনকে উন্নত মূল্যবোধ ও আদর্শ দ্বারা পরিশুদ্ধ করতে হয়। সাধনা ও শিক্ষার মাধ্যমেই মনের বিকাশ ঘটাতে হয় এবং মনুষ্যত্বের গুণ অর্জন করতে হয়।

সিদ্ধান্ত: প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র জন্মগতভাবে মানবদেহ বা প্রাণ থাকাই যথেষ্ট নয়। বরং মানব মনের মধ্যে থাকা শুভ ও কল্যাণকর চিন্তাধারা, উন্নত নৈতিকতা এবং মানবিক গুণাবলির যথার্থ বিকাশই মানুষকে সত্যিকারের মানুষ করে তোলে। মনুষ্যত্ব অর্জনই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত।

২। ভাব সম্প্রসারণ লেখ- "দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যাজ্য"

উত্তর:

দুর্জন বিদ্যান হলেও পরিত্যাজ্য

মূলভাব: জ্ঞান বা বিদ্যা হলো মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। কিন্তু একজন মানুষ যদি বিদ্বান বা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও দুর্জন বা খারাপ চরিত্রের অধিকারী হয়, তবে তার সঙ্গে পরিহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ। বিদ্যা দ্বারা অর্জিত জ্ঞান যদি মানুষের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ না করে, তবে সেই জ্ঞানের কোনো মূল্য থাকে না।

সম্প্রসারিত ভাব: বিদ্বান ব্যক্তি সমাজের আলো। তার জ্ঞানের প্রভাবে সমাজ আলোকিত হয় এবং উন্নতি লাভ করে। বিদ্যা মানুষকে যুক্তি ও বিবেকের পথে চালিত করে, তাকে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শেখায়। কিন্তু যখন এই জ্ঞানের অধিকারী কোনো ব্যক্তি তার বিদ্যাকে মানবিকতার পথে ব্যবহার না করে স্বার্থসিদ্ধি বা অন্যের ক্ষতিসাধনে ব্যবহার করে, তখনই সে দুর্জন হিসেবে চিহ্নিত হয়।

দুর্জনের জ্ঞান কেবল ক্ষতিকর। কারণ, তার বিদ্যা থাকে বিধ্বংসী শক্তির হাতিয়ারের মতো। সে তার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে চতুরতার সঙ্গে অন্যের ক্ষতি করতে পারে, মিথ্যা দিয়ে সত্যকে আড়াল করতে পারে এবং সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। সাপের মাথায় মণি থাকলেও যেমন তার বিষাক্ত স্বভাব দূর হয় না, তেমনি দুর্জনের জ্ঞান তাকে মহৎ করে না, বরং তার খারাপ কাজকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। বিষধর সাপকে যেমন তার মণির জন্য কেউ ঘরে স্থান দেয় না, তেমনি বিদ্বান দুর্জনের জ্ঞানকেও শ্রদ্ধা করা যায় না, তার সঙ্গেও ত্যাগ করা হয়।

অন্যদিকে, সজ্জন ব্যক্তি অল্পজ্ঞানী হলেও তার হৃদয় মহৎ এবং ব্যবহার সরল। তার দ্বারা সমাজের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং সে তার সীমিত জ্ঞান দিয়েও অপরের কল্যাণ করতে চায়। এই কারণে, বিদ্বান দুর্জনের চেয়ে সরলমতি সজ্জন ব্যক্তি হাজার গুণে কাম্য। বিদ্বান দুর্জনের সঙ্গে ত্যাগ না করলে তার চরিত্রগত খারাপ প্রভাব সহজে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিপদ ডেকে আনে।

সিদ্ধান্ত: মানুষের চরিত্রে উত্তম গুণাবলি থাকা জ্ঞানের চেয়েও বড়। চারিত্রিক মাধুর্য না থাকলে শুধু জ্ঞানের অহংকার মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়। তাই, ব্যক্তির চরিত্র বিচার করে তার সঙ্গে গ্রহণ করা উচিত। বিদ্বান হলেও দুর্জনের সঙ্গে সব সময় পরিত্যাগযোগ্য। চরিত্রই মানুষের আসল পরিচয় এবং মানব সমাজ এই সজ্জনদের দ্বারাই টিকে থাকে।

৩। ভাব সম্প্রসারণ লেখ- "স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন"

উত্তর:

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন

মূলভাব: স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার এবং জীবনের অমূল্য সম্পদ। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করা যেমন কঠিন, তার চেয়েও বেশি কঠিন হলো সেই অর্জিত স্বাধীনতাকে

রক্ষা করা এবং তার সার্থকতা প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে জাতি হিসেবে সব সময় সতর্ক ও সজাগ থাকতে হয়।

সম্প্রসারিত ভাব: দীর্ঘদিনের সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, এবং বহু আত্মত্যাগের বিনিময়ে একটি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে। পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একটি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তোলে, যার ফলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়। এই অর্জন নিঃসন্দেহে গৌরবের। কিন্তু স্বাধীনতার এই প্রাপ্তি এক নতুন ও বৃহত্তর দায়িত্বের সূচনা করে। স্বাধীনতা অর্জনগৌরবের। কিন্তু স্বাধীনতার এই প্রাপ্তি এক নতুন ও বৃহত্তর দায়িত্বের সূচনা করে। স্বাধীনতা অর্জন মূলত একটি নির্দিষ্ট সময়ের যুদ্ধ। কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা করা হলো চিরন্তন সংগ্রাম। স্বাধীনতা লাভমানেই সকল সমস্যা থেকে মুক্তি নয়; বরং এটি হলো একটি জাতির সামনে নিজেদের ভাগ্য গড়ার বিশাল সুযোগ। এই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে একটি জাতিকে সব দিক থেকে সজাগ, শক্তিশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হতে হয়।

স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো হলো:

১. অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র: জাতীয় সংহতি নষ্ট করে এমন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর অপতৎপরতা।
২. অর্থনৈতিক দুর্বলতা: দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও দুর্নীতি দেশের ভিতকে দুর্বল করে দেয়।
৩. জ্ঞান ও শিক্ষার অভাব: অজ্ঞতা ও কুসংস্কার একটি জাতিকে প্রগতির পথে এগোতে বাধা দেয়।
৪. বহিঃশত্রুর আক্রমণ: প্রতিবেশী বা শক্তিশালী রাষ্ট্রের আগ্রাসী মনোভাব।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সবাইকে দেশপ্রেম, সততা, নিষ্ঠা এবং কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। দেশের গণতন্ত্র, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায় ও সুশাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমেই স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকে। যেকোনো ধরনের নৈরাজ্য, দুর্নীতি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল স্বাধীনতার ভিত্তিকে ক্ষয়ে দেয়। তাই স্বাধীনতার চেতনাকে ধরে রেখে, সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হয়। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রতিটি মুহূর্তের সচেতনতা ও নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত: স্বাধীনতা অর্জন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষা একটি জীবন্ত প্রক্রিয়া। এটি শুধুমাত্র রাষ্ট্র বা সরকারের কাজ নয়, বরং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব। দেশের সার্বভৌমত্ব, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অর্জিত স্বাধীনতার মর্যাদা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব। তাই বলা যায়, স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করাই কঠিন এবং মহৎ কাজ।

৪। ভাব সম্প্রসারণ লেখ- "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"

উত্তর:

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড

মূলভাব: মানুষের শারীরিক কাঠামোতে মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া যেমন দেহের প্রধান অবলম্বন হিসেবে কাজ করে এবং তাকে সোজা ও সচল রাখে, তেমনি একটি জাতির ভিত্তি হলো শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোনো জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না, মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না এবং আত্মনির্ভরশীল হতে পারে না।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য গড়ে দেয় শিক্ষা। শিক্ষা মানুষের মধ্যে বিবেক, বুদ্ধি, জ্ঞান ও মূল্যবোধের জন্ম দেয়। শিক্ষা মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে, মনকে উদার করে এবং অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সহজেই ন্যায্য-অন্যায্য, সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে।

অন্যদিকে, একটি জাতির উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। সমাজের প্রতিটি সদস্য যখন শিক্ষায় আলোকিত হয়, তখন সেই জাতি দ্রুত প্রগতির পথে এগিয়ে যায়। শিক্ষা জাতির মধ্যে সচেতনতা, ঐক্য ও দেশপ্রেমের জন্ম দেয়। একটি শিক্ষিত জাতি সহজেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নিজেদের উন্নতি ঘটাতে পারে। বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায়, যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, তারা তত বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধ। এর বিপরীত অবস্থা হলো নিরক্ষরতা। নিরক্ষরতা একটি জাতির জন্য অভিশাপের মতো। নিরক্ষর মানুষ অন্ধের মতো, তারা সহজেই কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়। তাদের অজ্ঞতা ও অসচেতনতা সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে দেয়। শিক্ষাবিহীন জাতি দুর্বল, পরনির্ভরশীল এবং পশ্চাৎপদ হয়ে থাকে। যেমন মেরুদণ্ডহীন কোনো প্রাণী সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তেমনি শিক্ষা নামক মেরুদণ্ড ছাড়া কোনো জাতি মাথা উঁচু করে পৃথিবীতে নিজেদের স্থান করে নিতে পারে না। তাই, জাতির উন্নতি, স্বাধীনতা রক্ষা এবং বিশ্বসভায় সম্মানের আসন লাভের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

সিদ্ধান্ত: শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। এটি কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং এটি হলো জাতির আত্মিক শক্তির উৎস। সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও অন্ধকার দূর করে

একটি জাতিকে উন্নত ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই জাতীয় জীবনে শিক্ষার বিস্তার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা একান্ত কর্তব্য।

৫। ভাব সম্প্রসারণ লেখ- "সুশিক্ষিত লোক মানেই স্বশিক্ষিত"

উত্তর:

সুশিক্ষিত লোক মানেই স্বশিক্ষিত

মূলভাব: শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবনকে উন্নত করা এবং তাকে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। এই উন্নত শিক্ষা কেবল গতানুগতিক প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রি বা মুখস্থ বিদ্যায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, আগ্রহ ও নিরন্তর সাধনা। কেবল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করলেই কেউ সুশিক্ষিত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজ উদ্যোগে জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হয় এবং অর্জিত জ্ঞানকে জীবনে কাজে লাগায়। তাই বলা হয়েছে, সুশিক্ষিত ব্যক্তি মানেই স্বশিক্ষিত।

সম্প্রসারিত ভাব: শিক্ষা দুই ধরনের-একটি হলো আয়ত্ত করা এবং অন্যটি হলো উপলব্ধি করা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে শিক্ষা লাভ করা হয়, তা মূলত পরিবেশিত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে হৃদয়ে ধারণ করে, নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে, জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞানভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলে, সেই প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে শেষ হয়ে গেলেও, প্রকৃত শিক্ষা বা জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া চলতে থাকে আমৃত্যু।

মানুষের ভেতরের ঘুমন্ত সম্ভাবনাকে জাগিয়ে তোলার এবং মানসিক জগতের বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হলো স্বশিক্ষা। একজন মানুষ যখন স্বেচ্ছায়, আগ্রহের বশে এবং কৌতূহল মেটাতে নিজে নিজে কোনো বিষয়ে জানতে চায়, গবেষণা করে, পড়ে ও শেখে, তখনই সে স্বশিক্ষিত হয়ে ওঠে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অর্জিত জ্ঞানকে ভিত্তি করে যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি ধাপে নতুন কিছু জানতে ও শিখতে সচেষ্ট হন, তিনি হয়ে ওঠেন সুশিক্ষিত। অর্থাৎ, স্বশিক্ষাই একজন মানুষকে সত্যিকারের সুশিক্ষিত করে তোলে।

প্রকৃত শিক্ষকের কাজ হলো ছাত্রের মনে জ্ঞানের আগ্রহ সৃষ্টি করা। কিন্তু সেই আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার দায়িত্ব ছাত্রের নিজের। পৃথিবীতে এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ রয়েছেন, যারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বড় ডিগ্রি লাভ না করেও নিজ প্রচেষ্টায় বিশ্বকে জ্ঞানালোক দিয়ে আলোকিত করেছেন। যেমন-কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে সীমিত রেখেও স্ব-উদ্যোগে বিশাল জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁদের মতো মানুষেরাই প্রমাণ করেন যে, সুশিক্ষার মূল ভিত্তি হলো আত্মপ্রচেষ্টা বা স্বশিক্ষা।

সিদ্ধান্ত: ডিগ্রি বা সনদ মানুষকে জীবিকা অর্জনের পথ দেখাতে পারে, কিন্তু তা কখনোই জীবনের পূর্ণতার প্রতীক হতে পারে না। সত্যিকারের সুশিক্ষিত মানুষ হতে হলে নিজের ভেতরের জিজ্ঞাসাকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। স্বশিক্ষার এই ধারাই মানুষকে কেবল জ্ঞানী করে তোলে না, বরং তাকে উন্নত চরিত্র, বিবেকবান ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে। তাই, শিক্ষার আসল সার্থকতা নিহিত আছে স্বশিক্ষার মধ্যেই।

অধ্যায়
০৮

ভাষণ ও প্রতিবেদন



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ ভাষণ	
❖ প্রতিবেদন	
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	১	২	—
২০২৩	—	—	—
২০২২	—	১	—



“এককালে পৃথিবী বইয়ের উপর কাজ করত, এখন বই-ই
পৃথিবীর উপর কাজ করে”



-জুবার্ট

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য কী?

[বাকশির্বো: ১৩]

উত্তর: প্রতিবেদন রচনার রয়েছে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। যেমন-

- (ক) বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্টভাবে সবাইকে অবহিত করা,
- (খ) নিরপেক্ষভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করা,
- (গ) জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদান করা,
- (ঘ) কোনো বিষয়ে মতামত প্রদান করা,
- (ঙ) কাজের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা,
- (চ) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করা।

২। প্রতিবেদন কী?

[বাকশির্বো: '০৮]

উত্তর: কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে কোন তথ্য, ঘটনা, বক্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর কর্তৃপক্ষের নিকট ধারাবাহিক বিবরণী পেশ করাকে প্রতিবেদন বলে।

৩। বক্তৃতা কী?

[বাকশির্বো: ২৩]

উত্তর: কোনো বিষয়ে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বক্তা যা বলেন তাই বক্তৃতা।

৬। বক্তৃতার সবচাইতে বড় গুণ কী?

[বাকশির্বো: ২২]

উত্তর: বক্তৃতার সবচাইতে বড় গুণ বাচনভঙ্গি।

৭। বক্তার জন্য কয়টি উপাদান প্রয়োজন ও কী কী?

উত্তর: বক্তার জন্য তিনটি উপাদান। যথা-

- (১) শ্রোতা, (২) বক্তা এবং (৩) নির্দিষ্ট বিষয় ও সময়।

৮। প্রতিবেদনের কয়টি অংশ?

উত্তর: প্রতিবেদনের তিনটি অংশ।

৯। কোন ধরনের প্রতিবেদনে সারণি, চিত্র, নকশা ইত্যাদি থাকে।

উত্তর: বড় আকারের প্রতিবেদন সারণি, চিত্র, নকশা ইত্যাদি থাকে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। প্রতিবেদন কী? প্রতিবেদনে কয়টি অংশ থাকে ও কী কী? [বাকাশিবো: ২৪, ২২]

উত্তর: প্রতিবেদন বলতে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর সে বিষয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ধারাবাহিক বিবরণী বুঝায়। প্রতিবেদনের তিনটি অংশ। যথা: (ক) সূচনা (খ) মূলবক্তব্য (গ) উপসংহার।

২। বক্তৃতার উপাদান বক্তৃতার উপাদ কয়টি ও কী কী? আলোচনা কর।

উত্তর: বক্তৃতার উপাদান তিনটি। যথা: (১) শ্রোতা, (২) বক্তা, (৩) নির্দিষ্ট বিষয়।

বক্তৃতা প্রধানত দুই প্রকার।

যথা- (১) চিন্তাশ্রিত বক্তৃতা ও (২) ভাবাশ্রিত বক্তৃতা।

(১) চিন্তাশ্রিত বক্তৃতা: এ ধরনের বক্তৃতায় চিন্তার প্রাধান্য বেশি থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা ও সমাধান এই শিরোনামের বক্তৃতাটি হবে চিন্তাশ্রিত বক্তৃতা। এখানে থাকবে যুক্তি, তথ্য উপাত্তের প্রাধান্য। বক্তার ব্যক্তিগত আবেগ এখানে অবহেলিত হবে।

(২) ভাবাশ্রিত বক্তৃতা: ভাবাশ্রিত বক্তৃতার বক্তার আবেগ, বেগমান ভাষা অর্নগল বক্তব্য রাখার ক্ষমতা প্রাধান্য পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে- "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ" শিরোনামের বক্তৃতা হবে ভাবাশ্রিত বক্তৃতা।

৩। বক্তৃতা প্রদানে কী কী গুন থাকবে?

[বাকাশিবো ২৪]

উত্তর: বক্তৃতা প্রদানকালে ভাষার মৌখিক অনুশীলনের একটি পদ্ধতি হলো বক্তৃতা। এটি অনুশীলন প্রসূত একটানা কথা বলা একটি অভ্যাস। কোনো বিষয়ের সাবলীল ভাষার, যথোপযুক্ত শব্দ চয়নের

মাধ্যমে একটানা বক্তব্য উপস্থাপনই বক্তৃতা ভাষা অনুশীলনের একটি নন্দিত উপস্থাপনা। বক্তৃতা প্রদানকালে বক্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত-

- (১) বক্তৃতা শ্রোতার শোনার জন্য, তাই এর ভাষা যত সহজ ও সরল সম্ভব ততই ভালো। অলঙ্কারের বাহুল্য ও কথার মার-প্যাচটা যতদূর সম্ভব বর্জনীয়।
- (২) বক্তৃতার জন্য সাধারণত সময় নির্ধারিত থাকে। লক্ষ্য রাখার দরকার যাতে রচনাটি নির্ধারিত সময়ে খানিক পূর্বেই পড়া শেষ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে বক্তার বিচার বুদ্ধিই সর্বাপেক্ষ বড়।
- (৩) বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করার জন্য বক্তার মুখ, অঙ্গভঙ্গি বাক্যের বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিথিল বা দৃঢ় করতে হবে।
- (৪) বক্তৃতাটি ক্ষুদ্রায়তনের হতে হবে, যাতে শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে
- (৫) বক্তৃতায় বক্তার চিন্তার মৌলিকতা তুলে ধরতে হবে।
- (৬) বক্তৃতা বিষয়বস্তু পূর্বাপর সমাঙ্গস্যপূর্ণ হতে হবে।
- (৭) বক্তৃতা গুরুর সাথে সমাপ্তি মিল থাকতে হবে।
- (৮) অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জন ও সাবলীল ভঙ্গিতে বক্তৃতা
- (৯) উচ্চারণ ভঙ্গি বিশুদ্ধ এবং স্পষ্ট হতে হবে।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। বক্তৃতা কাকে বলে? একটি সফল বক্তৃতার অপরিহার্য উপাদানগুলো আলোচনা করো।

ভূমিকা: মানবজীবনে যোগাযোগ একটি অপরিহার্য অংশ। এই যোগাযোগের অন্যতম শক্তিশালী ও কার্যকর মাধ্যম হলো বক্তৃতা। বক্তৃতা শুধু কথার ফুলঝুরি নয়; এটি সুসংগঠিতভাবে কোনো বিষয় শ্রোতাদের সামনে উপস্থাপন করার একটি শিল্প। এর মাধ্যমে বক্তা শ্রোতাদের প্রভাবিত করতে, তথ্য সরবরাহ করতে বা তাদের উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হন।

বক্তৃতা: বক্তৃতা হলো একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে তৈরি করা সুচিন্তিত ও সুসংগঠিত বক্তব্য, যা একজন ব্যক্তি জনসমক্ষে বা সীমিত সংখ্যক শ্রোতার সামনে শ্রাব্য (Audible) ও বাচনভঙ্গির (Delivery) মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো-তথ্য প্রদান করা, বিনোদন দেওয়া, কোনো বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা অথবা শ্রোতাদের কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করা।

বক্তৃতার প্রধান উপাদানসমূহ:

একটি সফল বক্তৃতার জন্য প্রধানত তিনটি অপরিহার্য উপাদান প্রয়োজন:

ক. বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট:

বক্তৃতার মূল ভিত্তি হলো এর বিষয়বস্তু। এই অংশটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে:

- তথ্যগত নির্ভুলতা: প্রদত্ত তথ্য অবশ্যই সত্য ও নির্ভরযোগ্য হতে হবে।
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য: বক্তা কী বলতে চান এবং কেন বলতে চান, তা স্পষ্ট থাকতে হবে।
- শ্রোতা উপযোগী: শ্রোতাদের বয়স, শিক্ষা ও আগ্রহের কথা মাথায় রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সাজানো উচিত।
 - গঠনশৈলী: একটি বক্তৃতার সাধারণত তিনটি অংশ থাকে:
 - সূচনা/উপক্রমণিকা: শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং বক্তৃতার মূল বিষয়বস্তু তুলে ধরা।
 - মূল অংশ/আলোচনা: বিষয়বস্তুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা, যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে মূল বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করা।
 - উপসংহার: সমগ্র বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে একটি জোরালো আবেদন বা বার্তা প্রদান করা।

খ. ভাষা ও শৈলী:

বক্তৃতার বিষয়বস্তুকে কার্যকরভাবে তুলে ধরার জন্য ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান:

- সরল ও সুস্পষ্ট ভাষা: শ্রোতারা যেন সহজেই বক্তব্য বুঝতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শব্দ চয়ন: আবেগ, অনুভূতি বা বক্তব্যকে জোরালো করার জন্য সঠিক, শক্তিশালী ও অলংকারিক শব্দের ব্যবহার করা যেতে পারে।

- বাক্য গঠন: দীর্ঘ ও জটিল বাক্য এড়িয়ে সংক্ষিপ্ত, প্রাণবন্ত ও ছন্দময় বাক্য ব্যবহার করা ভালো।
- রস ও রসবোধ (Humour): ক্ষেত্রবিশেষে শ্রোতাদের আগ্রহ ধরে রাখতে এবং কঠিন বিষয় সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য রসবোধের ব্যবহার করা যেতে পারে।

গ. উপস্থাপন বা বাচনভঙ্গি:

বক্তা কীভাবে বক্তব্যটি পরিবেশন করছেন, তা-ও সাফল্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

- কণ্ঠস্বর (Voice): কণ্ঠস্বরের উচ্চতা (Loudness), গতি (Pace) ও স্বরক্ষেপণ (Pitch) পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে।
- দেহভঙ্গি (Body Language): বক্তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি (Gestures) ও চলাফেরা যেন আত্মবিশ্বাসী ও সাবলীল হয়।
- চোখের যোগাযোগ (Eye Contact): শ্রোতাদের সঙ্গে সরাসরি চোখের যোগাযোগ স্থাপন করলে তারা বেশি মনোযোগ দেয় এবং বক্তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে।
- উচ্চারণ: প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা অপরিহার্য।
- আবেগ ও অনুভূতি: বক্তার কথায় এবং ভঙ্গিতে যেন আন্তরিকতা ও বক্তব্যের প্রতি গভীর বিশ্বাস প্রকাশ পায়।

উপসংহার: বক্তৃতা হলো একাধারে জ্ঞান, শিল্প ও কৌশল। একটি সফল বক্তৃতা কেবল তথ্যের আদান-প্রদান নয়, এটি বক্তার ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান ও উপস্থাপনার কৌশলের প্রতিফলন। বক্তৃতা একটি দক্ষতা-যা অনুশীলন, সচেতনতা ও উল্লিখিত উপাদানসমূহের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব।

২। মহান বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর) উপলক্ষে একটি উদ্দীপনামূলক ভাষণ ও বক্তৃতা তৈরি কর:

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে ভাষণ/বক্তৃতা

(স্থান: স্কুল/কলেজের বা কোনো অনুষ্ঠানের মঞ্চ)

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, মঞ্চের উপবিষ্ট মাননীয় অতিথিবৃন্দ, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, এবং সামনে উপবিষ্ট আমার প্রিয় সহপাঠী ও দর্শক-শ্রোতাবৃন্দ,

আজ ১৬ই ডিসেম্বর, আমাদের মহান বিজয় দিবস। আজকের এই দিনে আমি বিনম্র শ্রদ্ধা ও গভীর ভালোবাসায় স্মরণ করছি সেই সব বীর শহীদদের, যাঁদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল আমাদের স্বাধীনতা। আজকের দিনে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিজয়ের এই গৌরবগাঁথা তুলে ধরার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

ভূমিকা: রক্তের অক্ষরে লেখা এক বিজয়গাথা।

ডিসেম্বরের এই দিনটি শুধু একটি ক্যালেন্ডারের তারিখ নয়, এটি বাঙালি জাতির অজেয় শক্তির প্রতীক। নয় মাস ধরে চলা রক্তক্ষয়ী এক জনযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছিল এই দিনে। ১৯৭১ সালের এই দিনে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল। জন্ম হয়েছিল বিশ্বের মানচিত্রে 'বাংলাদেশ' নামক একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের। এই বিজয় ছিল বাঙালির হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার স্বপ্নপূরণ।

মূল আলোচনা: প্রেরণার উৎস ও আত্মত্যাগ

আমাদের এই স্বাধীনতা এসেছে এক মহান নেতার ডাকে। তিনি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" আমাদের পুরো জাতিকে এক লহমায় স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা জীবনকে তুচ্ছ করে সমুখসমরে কাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, জনতা-সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছেন। ৩০ লক্ষ শহীদদের আত্মত্যাগ এবং ২ লক্ষ মা-বোনের সম্রমের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে এই বিজয়। এই আত্মত্যাগ আমাদের প্রেরণার চিরন্তন উৎস। তাঁদের ঋণ শোধ করার নয়। তাই আজকের দিনে গভীর শ্রদ্ধায় আমরা সেইসব বীর ও শহীদদের স্মরণ করছি।

প্রিয় বন্ধুরা,

বিজয় মানে কেবল শত্রুকে পরাজিত করা নয়। বিজয় মানে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে প্রতিষ্ঠা করা। বিজয় মানে শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে মুক্তির সনদ অর্জন করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও করণীয়: আমাদের শপথ

আমরা সেই প্রজন্ম, যারা স্বাধীন দেশের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠছি। আমাদের উপর রয়েছে একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব। আমাদের বিজয়কে অর্থবহ করে তুলতে হবে। আমাদের শপথ হোক-

১. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ: মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ-গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা এবং শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যকে বুকে ধারণ করা।
২. শিক্ষায় আত্মনিয়োগ: শহীদদের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষায়। কারণ সুশিক্ষিত জাতিই পারে দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে।
৩. দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়া: দেশকে দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা।
৪. দেশপ্রেম ও ঐক্য: যেকোনো পরিস্থিতিতে দেশের প্রতি ভালোবাসা ও জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা।

উপসংহার: এগিয়ে চলুক বাংলাদেশ। আজকের এই শুভ দিনে আমরা যেন শুধু আনন্দেই মেতে না থাকি, বরং শহীদদের স্বপ্ন পূরণের অঙ্গীকার করি। আমাদের রক্ত দিয়ে কেনা এই স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রেখে আমরা যেন বিশ্বদরবারে বাংলাদেশকে এক উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি-এই হোক আমাদের বিজয় দিবসের একমাত্র ব্রত।

সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক!

অধ্যায়
০৩

বাংলা ধ্বনিত্ব



এই অধ্যায়ের প্রধান সূচিপত্র (contents)

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
❖ অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি	
❖ রচনামূলক প্রশ্নাবলি	

বোর্ড প্রশ্নাবলির বিশ্লেষণ (Board Questions Analysis)

এই অধ্যায় থেকে বিগত পাঁচ বছরের ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেরিন পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন। নিচে ‘Board Questions Analysis’ অংশে এই অধ্যায় থেকে কোন সালে কোন বোর্ডে কতটি প্রশ্ন হয়েছে তা দেখানো হলো।

সাল \ বোর্ড	অতি সংক্ষিপ্ত	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	রচনামূলক প্রশ্ন
২০২৪	১	১	—
২০২৩	—	১	—
২০২২	—	১	—



“শিক্ষার শেকড়ের স্বাদ তেতৌ হলেও এর ফল মিষ্টি”



-এরিস্টটল

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পত্র কাকে বলে?

উত্তর: 'পত্র' শব্দের অর্থ হচ্ছে পাতা। সভ্যতার আদি যুগে যখন কাগজের আবিষ্কার হয়নি তখন মানুষ বিভিন্ন গাছের পত্রে কোন কিছু লিখে রাখত বলে আজো লিখিত সংবাদকে 'পত্র' বলা হয়।

২। পত্র প্রধানত কয় প্রকার ও কী কী?

উত্তর: পত্র প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

(ক) ব্যক্তিগত পত্র বা সাংসারিক পত্র

(খ) ব্যবহারিক পত্র বা বৈষয়িক পত্র।

৩। ব্যক্তিগত পত্রের কয়টি অংশ থাকে?

[বাকাশিবো ২০২৪]

উত্তর: ব্যক্তিগত পত্রের দুটি অংশ। যথা- (১) ভিতরের অংশ (২) বাইরের অংশ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। পত্রের ভিতরের অংশে কয়টি অংশ থাকে? সে সম্পর্কে আলোচনা কর।

[বাকাশিবো ২৪, ২৩, ২২]

উত্তর: পত্রের ভিতরে যে অংশে থাকে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) ভিতরের অংশ: ভিতরের অংশে আবার ৫ টি অংশ থাকে। যেমন-

I. মঙ্গলাচরণ: যে কাগজে পত্র লেখা হয় তার ঠিক উপরে মাঝামাঝি জায়গায় মুসলমান রীতিতে আল্লাহ্, এলাহী ভরসা, ইয়ারব ইত্যাদি এবং হিন্দুরীতিতে দেবদেবীর নাম দেয়া হয়। এগুলোকে মঙ্গলাচরণ বলে।

II. 11. পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ: পত্রের উপরিভাগে ডানদিকের কোণে পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ দিতে হয়।

- III. সম্বোধন বা পাঠ সম্ভাষণ: পত্রের মূল বক্তব্য লেখার আগে যার কাছে পত্র লিখছে তাকে কিছু সম্বোধন করতে হয় একেই বলে সম্বোধন বা পাঠ সম্ভাষণ।
- IV. মূল বক্তব্য: পত্রলেখকের মূল বিষয়বস্তুকে মূল বক্তব্য বলা হয়।
- V. পত্রলেখকের নাম ও স্বাক্ষর: মূল বক্তব্য শেষে পত্র লেখক 'ইতি' দিয়ে তার নাম সই করতে হয়।

(২) বাইরের অংশ: বাইরের অংশ হচ্ছে খাম। খামের ডান দিকে প্রাপকের নাম ঠিকানা খামের বাম দিকে থাকে পত্রপ্রেরকের ঠিকানা। এই অংশকে শিরোনামও বলা হয়।

২। দরখাস্ত লেখার নিয়মগুলো বর্ণনা কর।

উত্তর: দরখাস্ত লেখার নিয়মগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো:

- (১) দরখাস্তের সূচনায় কর্তৃপক্ষের পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ করতে হবে। পদবীর পূর্বে 'বরাবর' অথবা মাননীয় শব্দটি উল্লেখ করতে হবে।
- (২) আবেদনের বিষয় উল্লেখ করতে হবে।
- (৩) 'জনাব' অথবা 'মহোদয়' দিয়ে সম্বোধন করতে হবে।
- (৪) দরখাস্তের মূল বক্তব্য অংশে দুটি ভাগ থাকে। প্রথম ভাগে থাকে আবেদনের কারণ, দ্বিতীয় ভাগে থাকে আবেদনের স্বপক্ষে সুপারিশ।
- (৫) সবশেষে ডান দিকে 'বিনীত' শব্দটি লিখে দরখাস্তকারীর নাম উল্লেখ করতে হয়।
- (৬) দরখাস্তের বাম দিকে তারিখ লিখতে হয়।
- (৭) চাকরির দরখাস্তের ক্ষেত্রে জীবন বৃত্তান্ত ও সংযুক্তি নাম উল্লেখ করতে হয়।

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

১। যোগদানপত্র ও স্মারকলিপি বর্ণনা কর।

উত্তর:

যোগদানপত্র (Joining Letter)

যোগদানপত্র হলো এমন একটি দাপ্তরিক চিঠি যা কোনো ব্যক্তি নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় বা বদলি হয়ে নতুন কর্মস্থলে দায়িত্ব গ্রহণের সময় কর্তৃপক্ষকে লিখে থাকেন। এর মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টি জানান।

লেখার নিয়ম ও অংশসমূহ

যোগদানপত্র সাধারণত নিম্নলিখিত অংশগুলো দিয়ে লেখা হয়:

- ১ **তারিখ ও স্থান:** পত্র লেখার তারিখ ও স্থান।
- ২ **প্রাপক:** যাঁর কাছে বা যে দপ্তরের প্রধানের কাছে যোগদানপত্রটি পাঠানো হচ্ছে, তাঁর পদবি ও ঠিকানা। (যেমন: প্রধান শিক্ষক/ব্যবস্থাপক/পরিচালক)।
- ৩ **বিষয়:** পত্রের মূল বক্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা। (যেমন: 'নতুন পদে যোগদান প্রসঙ্গে' বা 'বদলি জনিত কারণে যোগদানপত্র')।
- ৪ **সম্বোধন:** উপযুক্ত সম্ভাষণ (যেমন: জনাব/মহোদয়)।
- ৫ **মূল বক্তব্য:**
 - নিয়োগ বা বদলির সূত্র (যেমন: নিয়োগপত্র বা বদলির আদেশের স্মারক নম্বর ও তারিখ) উল্লেখ করা।
 - নির্দিষ্ট তারিখে, নির্দিষ্ট পদে দায়িত্ব গ্রহণের কথা স্পষ্টভাবে জানানো।
 - কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা।
- ৬ **স্বাক্ষর:** পত্র লেখকের স্বাক্ষর, নাম (স্পষ্ট করে) এবং নতুন পদের পদবি উল্লেখ করা।

উদাহরনস্বরূপ:

মনে কর, তুমি সরকারি হাইস্কুলে একজন সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপত্র পেয়েছো এবং আজ তোমার নতুন কর্মস্থলে যোগদান করার কথা।

তারিখ: ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি.

বরাবর,

প্রধান শিক্ষক,

(রাজাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়),

(টাংগাইল, ঢাকা)

বিষয়: সহকারী শিক্ষক পদে যোগদান প্রসঙ্গে।

জনাব/মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত ০৮/১০/২০২৫ খ্রি. তারিখের স্মারক নম্বর:

শি.ম./প্রশা-৫/নিয়োগ-২০২৫/১৮২ অনুযায়ী আমি সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগপত্র লাভ করেছি।

উক্ত নিয়োগপত্রের নির্দেশ মোতাবেক আমি আজ, ১৬ অক্টোবর, ২০২৫ খ্রি., আপনার বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক (বাংলা) পদে পূর্বাহ্নে যোগদান করলাম এবং দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।

আপনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকব বলে অঙ্গীকার করছি।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত নিবেদক,

(স্বাক্ষর)

নাম: মো. মেহেদী হাসান

পদবি: সহকারী শিক্ষক

ঠিকানা: (যোগাযোগের ঠিকানা)

স্মারকলিপি (Memorandum)

স্মারকলিপি: স্মারকলিপি হলো এমন একটি দলিল বা আবেদনপত্র যা সাধারণত কোনো সংস্থা, গোষ্ঠী, দল বা ব্যক্তিগোষ্ঠী তাদের দাবি-দাওয়া, অভিযোগ বা কোনো সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে পেশ করার জন্য তৈরি করে।

লেখার নিয়ম ও অংশসমূহ]

স্মারকলিপি অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক হয়:

- ১ **শিরোনাম:** স্মারকলিপির একেবারে উপরে একটি আকর্ষণীয় ও সুস্পষ্ট শিরোনাম দেওয়া হয়, যাতে মূল বিষয়বস্তু বোঝা যায়। (যেমন: 'নদী ভাঙন রোধে কর্তৃপক্ষের নিকট এলাকাসীরা স্মারকলিপি')।
- ২ **প্রাপক:** যাঁর কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হচ্ছে, তাঁর পদবি ও ঠিকানা।
- ৩ **উৎস:** যে দল বা সংস্থার পক্ষ থেকে স্মারকলিপি পেশ করা হচ্ছে তাদের নাম (যেমন- এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ/শিক্ষার্থী পরিষদ)।
- ৪ **ভূমিকা:** স্মারকলিপি পেশ করার কারণ ও প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে তুলে ধরা।
- ৫ **মূল বক্তব্য:**
 - সমস্যার বিবরণ: সমস্যাটির বিস্তারিত ও তথ্যভিত্তিক বর্ণনা দেওয়া।
 - দাবি/প্রস্তাবসমূহ: সমস্যা সমাধানের জন্য দাবি বা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো বুলেট পয়েন্ট বা ক্রমানুসারে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা।
- ৬ **উপসংহার ও প্রত্যাশা:** দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানানো এবং সমস্যা সমাধানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করা।
- ৭ **স্বাক্ষর:** স্মারকলিপি পেশকারী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে কয়েকজন প্রতিনিধির বা প্রধানের স্বাক্ষর, নাম ও পদবি (যদি থাকে) উল্লেখ করা।

উদাহরনস্বরূপ:

মনে করো, তোমার এলাকার ডেঙ্গু ও জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলাকাবাসী হিসেবে তোমার সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে স্মারকলিপি দিচ্ছে:

ডেঙ্গু ও জলাবদ্ধতা নিরসনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্মারকলিপি

বরাবর,

মাননীয় মেয়র,

(সিটি কর্পোরেশনের নাম, যেমন: ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন),

(ঠিকানা)।

বিষয়: (এলাকার নাম, যেমন: মিরপুর-১০, সেকশন-৬) এলাকায় ডেঙ্গু মশা নিধন ও জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবিতে স্মারকলিপি পেশ।

মহোদয়,

আমরা আপনার সিটি কর্পোরেশন এলাকার (এলাকার নাম) সাধারণ বাসিন্দা। আপনার মাধ্যমে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এলাকায় বিরাজমান চরম সমস্যাগুলো আপনার দৃষ্টিগোচর করছি। সাম্প্রতিক সময়ে আমাদের এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। একই সাথে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকার রাস্তাঘাট ও অলিগলিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। মূলত প্রধান সমস্যাগুলো হলো:

১. ডেঙ্গুর প্রকোপ: মশার লার্ভা জমে থাকা ও নিয়মিত মশা নিধন স্প্রে না হওয়ার কারণে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
২. জলাবদ্ধতা: ড্রেনেজ ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে না, ফলে রাস্তাঘাটে দীর্ঘ সময় ধরে নোংরা পানি জমে থাকে।
৩. ময়লা-আবর্জনা: প্রধান সড়ক ও গলিপথে নিয়মিত ময়লা না সরানোয় পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এবং তা রোগের জন্ম দিচ্ছে।
৪. জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি: জলাবদ্ধতা ও আবর্জনাজনিত কারণে শিশু ও বয়স্করা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

এমতাবস্থায়, জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আপনার কাছে দ্রুত নিম্নলিখিত দাবিগুলো জানাচ্ছি:

দাবিসমূহ:

১. এলাকায় নিয়মিত ও কার্যকরভাবে মশা নিধন স্প্রে করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. বন্ধ থাকা ড্রেনগুলো জরুরি ভিত্তিতে পরিষ্কার ও সংস্কারের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন করা।
৩. প্রধান সড়ক ও অলিগলির আবর্জনা নিয়মিত ও সময়মতো অপসারণের ব্যবস্থা করা।

আমরা আশা করি, আপনি আমাদের এই ন্যায্য দাবিগুলো মানবিকভাবে বিবেচনা করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং এলাকাবাসীকে স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে মুক্তি দেবেন।

ধন্যবাদান্তে,

বিনীত নিবেদক,

(এলাকার নাম) এলাকাবাসীর পক্ষে: মো: মেহেদী হাসান

ক্রমিক	নাম	পিতার নাম	ঠিকানা	স্বাক্ষর
১.	ক, খ, গ	ঘ, ঙ, চ	(এলাকার নাম)	
২.	চ, ছ, জ	ঝ, ঞ, ট	(এলাকার নাম)	
৩.	ট, ঠ, ড	ঢ, ণ, ত	(এলাকার নাম)	

অধ্যায়
১০

প্রবন্ধ রচনা

১। প্রবন্ধ লেখ- দেশপ্রেম।

উত্তর:

দেশপ্রেম

ভূমিকা: নিজ জন্মভূমি ও দেশের প্রতি মানুষের গভীর ভালোবাসা, মমত্ববোধ ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধাকেই দেশপ্রেম বা স্বদেশপ্রেম বলে। মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, যে দেশের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠে, সে দেশের প্রতি তার টান স্বাভাবিক ও চিরন্তন। তাই জন্মভূমিকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। দেশপ্রেম মানবজীবনের এক অমূল্য সম্পদ ও মহৎ গুণ।

দেশপ্রেমের স্বরূপ: দেশপ্রেম হলো দেশের মাটি, মানুষ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ। দেশের কল্যাণে ও অগ্রগতির জন্য নিজের সব স্বার্থ ত্যাগ করে নিজেকে উৎসর্গ করার মানসিকতাই হলো দেশপ্রেম। কেবল মুখে দেশের গুণগান করাই দেশপ্রেম নয়, দেশের সেবার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকাই হলো প্রকৃত দেশপ্রেম। এই প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে।"

দেশপ্রেমের গুরুত্ব: দেশপ্রেম একটি জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। দেশপ্রেম মানুষকে মহৎ, উদার ও আত্মত্যাগী হতে শেখায়। এই গুণ মানুষকে সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করে এবং বৃহত্তর কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। দেশপ্রেমের বলেই মানুষ দেশের দুর্দিনে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করে না। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, দেশের উন্নয়ন সাধন এবং দেশের সম্মান বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য দেশপ্রেম অপরিহার্য।

দেশপ্রেমের প্রকাশ: দেশপ্রেম নানাভাবে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন:

দেশের প্রতি কর্তব্য পালন: দেশের আইন মেনে চলা, নিয়মিত কর প্রদান করা এবং দেশের সম্পদ রক্ষা করা।

দেশের সংস্কৃতি ও ভাষা রক্ষা: বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ভালোবাসা ও এর চর্চা করা।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা: সুনামগরিক হিসেবে গড়ে ওঠা এবং মন দিয়ে লেখাপড়া করে দেশের কল্যাণে নিজেকে প্রস্তুত করা।

মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দেশের দামাল ছেলেরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন বাজি রেখে স্বাধীনতা এনেছিল। এটি দেশপ্রেমের চরমতম প্রকাশ।

জাতীয়তাবোধ: জাতীয় দিবসগুলো পালন করা এবং দেশের ঐতিহ্য ও ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন থাকা।

দেশপ্রেম ও বর্তমান সমাজ: বর্তমান সময়ে দেশপ্রেমের গুরুত্ব আরও বেশি। দেশের উন্নয়ন ও প্রগতির জন্য প্রতিটি নাগরিকের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। নিজের দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি দূর করা সম্ভব। ছাত্রজীবন থেকেই দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হওয়া দরকার

উপসংহার: দেশপ্রেম মানবজীবনের এক শ্রেষ্ঠতম গুণ। দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশের প্রতি ভালোবাসাকে সদা জাগ্রত রাখতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে দেশের জন্য কাজ করা উচিত। প্রকৃত দেশপ্রেমিকেরাই একটি জাতিকে বিশ্বসভায় সম্মানিত করতে পারে। মনীষীদের মতে, "দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।" দেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই হোক আমাদের জীবনের প্রধান ব্রত।

২। প্রবন্ধ লেখ- কর্মমুখী শিক্ষা।

উত্তর:

কর্মমুখী শিক্ষা

ভূমিকা: শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু যে শিক্ষা মানুষকে কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়, জীবিকা অর্জনে সহায়তা করে না, সে শিক্ষা বর্তমান যুগে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ। মানুষের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সামর্থ্য ও দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলার শিক্ষাই হলো কর্মমুখী শিক্ষা বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা। এই শিক্ষা মানুষকে হাতে-কলমে কাজ শিখিয়ে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

বেকারত্ব দূরীকরণ: কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব আজ অপরিসীম। আমাদের দেশে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষার ফলে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত যুবক-যুবতী বেকারত্বের অভিশাপ বয়ে বেড়ায়। কর্মমুখী শিক্ষা এই বেকারত লাঘরে সরাসরি ভূমিকা রাখে। এ শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাচাকরির পিছনে না ছুটে নিজেরাই স্বাবলম্বী হতে পারে, এমনকি অন্যদের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন: কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি দেশের শিল্প, কৃষি ও প্রযুক্তি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক। দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে প্রেরণের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি আনে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন: দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে কেবল বোঝা না রেখে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করার একমাত্র চাবিকাঠি হলো কর্মমুখী শিক্ষা।

কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র ও প্রসার: কর্মমুখী শিক্ষা কেবল গতানুগতিক পেশার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইলেকট্রনিক্স মেরামত, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, গ্রাফিক্স ডিজাইন, পোশাক তৈরি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, নার্সিং এবং বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত। সরকারও বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কৃষিবিজ্ঞান, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং বিভিন্ন বেসিক ট্রেড কোর্স চালুর মাধ্যমে এর প্রসার ঘটচ্ছে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো এই শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশে কাজ করছে।

উপসংহার: আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এবং দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে হলে কর্মমুখী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষিত সমাজের কুসংস্কার ও গতানুগতিক ধারণাকে পরিহার করে বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হওয়া উচিত। আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য কর্মমুখী শিক্ষাকে জাতীয়ভাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

৩। প্রবন্ধ লেখ- মাদকাসক্তির কুফল ও প্রতিকার।

উত্তর:

মাদকাসক্তির কুফল ও প্রতিকার

ভূমিকা: মাদকাসক্তি হলো এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধি, যা কেবল একজন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যই নষ্ট করে না, বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানে। মাদকদ্রব্যের প্রতি তীব্র আসক্তি মানুষকে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ঠেলে দেয়। বর্তমানে যুবসমাজ এই মরণ নেশার শিকার হয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। তাই মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং এর প্রতিকারে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

মাদকাসক্তির ভয়াবহ কুফল: মাদকাসক্তির প্রভাব বহুমাত্রিক এবং সুদূরপ্রসারী। এর ক্ষতিকর প্রভাবগুলোকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. শারীরিক ক্ষতি: মাদকদ্রব্যের নিয়মিত সেবনে শরীরের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- **মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি:** মাদক মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যকারিতা ব্যাহত করে, ফলে স্মৃতিশক্তি ও শেখার ক্ষমতা কমে যায়। এটি বিচার-বিবেচনার ক্ষমতা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
- **গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের রোগ:** দীর্ঘদিন মাদক সেবনে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ফুসফুসের ক্যান্সার এবং যক্ষ্মা হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।
- **সংক্রামক রোগ:** ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি (এইডস), হেপাটাইটিস-বি ও সি-এর মতো মারাত্মক সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।
- **সাধারণ স্বাস্থ্যহানি:** এটি স্বাভাবিক খাদ্য অভ্যাস নষ্ট করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে এবং যৌন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

২. মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি: মাদকাসক্তি একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে।

- হতাশা ও আগ্রাসী মনোভাব: মাদকাসক্ত ব্যক্তির প্রায়শই তীব্র হতাশা ও বিষণ্ণতায় ভোগেন। তাদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকে না, যা উগ্র ও সহিংস আচরণের জন্ম দেয়।
- আত্মহত্যার প্রবণতা: মানসিক পীড়ন বেড়ে যাওয়ায় অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।
- ভারসাম্যহীনতা: মাদকাসক্তির কারণে মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

৩. অর্থনৈতিক ক্ষতি: মাদকের নেশা একজন ব্যক্তিকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেয়।

- সম্পদহানি: মাদক কেনার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে আসক্ত ব্যক্তির সর্বস্বান্ত হয় এবং পরিবারের উপর অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দেয়।
- অপরাধপ্রবণতা: অর্থের অভাবে চুরি, ছিনতাই এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ করতে তারা দ্বিধা করে না।
- কর্মক্ষমতা হ্রাস: মাদকের প্রভাবে কর্মদক্ষতা কমে যাওয়ায় অনেকে চাকরি বা কাজ হারায়, যা তাদের দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দেয়।

৪. সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষতি: মাদকাসক্তি সামাজিক কাঠামো ও পারিবারিক বন্ধনকে ছিন্ন করে দেয়।

- পারিবারিক অশান্তি: মাদকাসক্তের কারণে পরিবারে চরম অশান্তি, কলহ এবং অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে পরিবারে ভাঙন ডেকে আনে।
- সামাজিক বিচ্ছিন্নতা: মাদকাসক্ত ব্যক্তি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং সামাজিক নিন্দা ও ঘৃণার শিকার হয়।
- অপরাধের বিস্তার: মাদকাসক্তি সমাজে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায়।

মাদকাসক্তি প্রতিকারে করণীয়:

মাদকাসক্তি প্রতিরোধ ও প্রতিকার একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়-সব স্তরেই কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

১. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা:

- পারিবারিক ভূমিকা: সন্তানের প্রতি অভিভাবকদের সতর্ক দৃষ্টি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা অপরিহার্য। সন্তানেরা যেন হতাশ না হয় বা কৌতূহলবশত মাদকের দিকে না ঝোঁকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- শিক্ষা ও সচেতনতা: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যসূচির মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সেমিনারের মাধ্যমে মাদকের কুফল সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে প্রচার মাধ্যমগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।
- গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ: যুব সমাজকে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহিত করতে হবে, যাতে তারা মাদকের চিন্তা থেকে দূরে থাকতে পারে।
- সঠিক বন্ধু নির্বাচন: খারাপ বা মাদকাসক্ত বন্ধু-বান্ধব এড়িয়ে চলতে হবে এবং মাদক পরিহারের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

২. প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা:

- চিকিৎসা ও পুনর্বাসন: মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে দ্রুত কোনো ভালো নিরাময় কেন্দ্রে
- (Rehabilitation Centre) চিকিৎসার জন্য ভর্তি করতে হবে। চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় ডিটক্সিফিকেশন, কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপি অত্যন্ত জরুরি।
- পারিবারিক সমর্থন: চিকিৎসার সময় এবং সুস্থ হওয়ার পরেও পরিবারের সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ও ভালোবাসা মাদকাসক্তের জন্য খুব প্রয়োজন। ঘৃণা না করে সহানুভূতি ও সাহস দিয়ে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে হবে।

- সামাজিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা: সুস্থ হয়ে ওঠা ব্যক্তিকে সমাজ যেন সহজেই গ্রহণ করে নেয় এবং তাকে কর্মসংস্থান বা গঠনমূলক কাজে যুক্ত হওয়ার সুযোগ দেয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. আইনি ও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ:

- মাদক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ: মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, পরিবহন, বিপণন ও সহজলভ্যতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং মাদক চোরাচালানকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- আইন প্রয়োগ: মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: আন্তঃসীমান্ত মাদক পাচার রোধে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে হবে।

উপসংহার: মাদকাসক্তি হলো জাতির জন্য এক নীরব ঘাতক। এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক সচেতনতা এবং রাষ্ট্রীয় কঠোরতা প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ যদি মাদকমুক্ত থাকার অঙ্গীকার করে এবং মাদকাসক্তদের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়, তবেই কেবল একটি সুস্থ ও নিরাপদ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মাদকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয়ী হয়ে একটি সোনালী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য এখনই সময় সম্মিলিতভাবে কাজ করা।

৪। প্রবন্ধ লেখ- ইন্টারনেট ও আজকের বিশ্ব।

উত্তর:

ইন্টারনেট ও আজকের বিশ্ব

ভূমিকা: একবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। আর এই যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বৈপ্লবিক আবিষ্কার হলো ইন্টারনেট। ইন্টারন্যাশনাল নেটওয়ার্ক (International Network)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ এই ইন্টারনেট আজ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি কেবল একটি প্রযুক্তি নয়, বরং এটি আজকের বিশ্বকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছে, শারীরিক দূরত্বকে তুচ্ছ করে গোটা পৃথিবীকে পরিণত করেছে একটি 'বিশ্বগ্রাম' (Global Village)-এ। ইন্টারনেটকে তাই আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

ইন্টারনেট: ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত অসংখ্য কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বিশাল ব্যবস্থা, যা আইপি (Internet Protocol) নামক নির্দিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করে। এটিকে 'নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক' বলা হয়, যার মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্তের তথ্য মুহূর্তের মধ্যে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়।

আজকের বিশ্বে ইন্টারনেটের প্রভাব ও গুরুত্ব: ইন্টারনেট আজকের বিশ্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে একবৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এর প্রভাব ও গুরুত্ব অপারিসীম:

১. যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান:

ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করেছে। ই-মেইল, ভিডিও কল, চ্যাটিং অ্যাপস এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর (যেমন: ফেসবুক, টুইটার) মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব। এটি সংবাদ আদান-প্রদানকে করেছে দ্রুত ও সহজলভ্য, যার ফলে যেকোনো তাজা খবর মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের সবার কাছে পৌঁছে যায়।

২. শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন:

শিক্ষাক্ষেত্রে ইন্টারনেট এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

- তথ্য ভান্ডার: ইন্টারনেট হলো তথ্যের বিশাল ভান্ডার। শিক্ষার্থীরা যেকোনো বিষয়ে মুহূর্তেই কাক্ষিত তথ্য অনুসন্ধান করতে পারে।
- অনলাইন শিক্ষা: দূরশিক্ষণ (Distance Learning) বা ই-লার্নিং-এর মাধ্যমে বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কোর্স এবং শিক্ষা সামগ্রী এখন হাতের মুঠোয়। করোনাকালীন সময়ে ইন্টারনেটই পড়াশোনা সচল রেখেছিল।
- গবেষণা: গবেষকরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ই-লাইব্রেরি ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের গবেষণাপত্র ও তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

৩. অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য (ই-কমার্স): ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারণাকে ইন্টারনেট পাল্টে দিয়েছে।

- ই-কমার্স: ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্সের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতারা ঘরে বসেই পণ্য ও সেবা ক্রয়-বিক্রয় করতে পারছে।
- ফ্রিল্যান্সিং: ইন্টারনেট হাজার হাজার মানুষের জন্য নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে, যেমন- ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ঘরে বসে আন্তর্জাতিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ব্যাংকিং: ইন্টারনেট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন হয়েছে সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ।

৪. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা: চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ইন্টারনেটের ব্যবহার অনস্বীকার্য।

- তথ্য ও পরামর্শ: রোগীরা অনলাইনে রোগ সম্পর্কে তথ্য জানতে পারে এবং প্রয়োজনে দূর থেকেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারে (টেলিমেডিসিন)।
- গবেষণা: নতুন নতুন চিকিৎসা পদ্ধতি ও ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণা তথ্য মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের সব চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে যায়।

৫. প্রশাসন ও দৈনন্দিন জীবন: ইন্টারনেট সরকারি ও বেসরকারি নানা কার্যক্রমকে সহজ করেছে।

- ই-গভর্ন্যান্স: সরকারি সেবাগুলো অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে, যেমন: পরীক্ষার ফলাফল, চাকরির আবেদন, বিভিন্ন বিল পরিশোধ ইত্যাদি।
- বিনোদনের মাধ্যম: গান, সিনেমা, গেম এবং অনলাইন স্ট্রিমিং সেবার মাধ্যমে ইন্টারনেট সহজলভ্য বিনোদনের সুযোগ করে দিয়েছে।

ইন্টারনেটের নেতিবাচক প্রভাব: ইন্টারনেট যেমন মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ, তেমনি এর কিছু

নেতিবাচক দিকও রয়েছে:

- তথ্য নিরাপত্তা ও সাইবার অপরাধ: হ্যাকিং, ভাইরাস আক্রমণ, ফিশিং এবং অনলাইন প্রতারণার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

- অতিরিক্ত আসক্তি: অতিরিক্ত ইন্টারনেট, বিশেষত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তির কারণে মানুষ বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এটি মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়াচ্ছে।
- অশালীন কনটেন্টের বিস্তার: ইন্টারনেটের মাধ্যমে অশ্লীল ছবি ও আপত্তিকর কার্যকলাপ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যা তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হচ্ছে।
- শারীরিক সমস্যা: দীর্ঘ সময় ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে চোখের সমস্যা, ঘাড় ও কোমর ব্যথা, এবং ঘুমের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

উপসংহার: ইন্টারনেট আজকের বিশ্বকে একটি নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। এটি সভ্যতার অগ্রগতিকে করেছে ত্বরান্বিত। নিঃসন্দেহে ইন্টারনেট একটি অপরিহার্য শক্তি, যা ছাড়া আধুনিক জীবনব্যবস্থা অচল। তবে এর সর্বোচ্চ সুফল পেতে হলে এর অপব্যবহার রোধ করা এবং সচেতনভাবে ব্যবহার করা জরুরি। তথ্যপ্রযুক্তির এই শক্তিকে ইতিবাচক কাজে লাগিয়েই আজকের বিশ্ব আরও উন্নত, সমৃদ্ধ এবং মানবিক বিশ্বগ্রামে পরিণত হবে-এটাই আমাদের প্রত্যাশা।